মাসিক
আল-আবরার

الأبرار

The Monthly AL-ABRAR

مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

রেজি. নং-১৪৫ বর্ষ-৯, সংখ্যা-১২

ডিসেম্বর ২০২০ ইং, রবিউস সানি ১৪৪২ হি., অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২৭ বাং

ربيع الثانى ١٤٤٢ھ، ديسمبر ٢٠٢٠م

প্রতিষ্ঠাতা

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

প্রধান সম্পাদক

মুফতী আরশাদ রহমানী

সম্পাদক

মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক

নির্বাহী সম্পাদক

মাওলানা রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

সহকারী সম্পাদক

মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি

মুহাম্মদ হাশেম

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা

মুফতী এনামুল হক কাসেমী
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফিকুল ইসলাম আল-মাদানী

সার্কুলেশন বিষয়ে যোগাযোগ

০১৯৭৮৪২৪৬৪৭

বিনিময় : ২০ (বিশ) টাকা মাত্র

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
ব্লক-ডি, ফকীহুল মিল্লাত সরণি, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা।
ফোন : ০২-৮৪৩২০৯১, ০২-৮৮৪৫১৩৮
ই-মেইল : monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েব : www.monthlyalabrar.com
www.facebook.com/মাসিক-আল-আবরার

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২
পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে : ৪
পবিত্র সুন্নাহ থেকে :
'ফাজায়েলে আমাল' নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-৬৯..... ৭
হযরত হারদূয়ী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী ৯
ইফাদাতে ফকীহুল মিল্লাত :
তাওবাকারী আল্লাহ তা'আলার কাছে গোনাহগার নয়...১০
"সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরলপথ :
হালাল খাদ্য ও 'ই-কোড' সম্পর্কিত শরঈ বিধান..... ১২
শায়খুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক সাহেব (দা.বা.)
আকাবিরে দেওবন্দের ওপর আরোপিত অভিযোগগুলোর সমুচিত জবাব ও সন্দেহের নিরসন-২..... ২২
হাকিমুল ইসলাম ক্বারী মুহাম্মদ তৈয়ব (রহ.)
নিজের এসলাহ সবার আগে..... ২৫
শায়খুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মদ তকী উসমানী
পবিত্র কোরআন অনুবাদের মূলনীতি..... ২৮
মুফতী শরীফুল আজম
শরীয়তের দৃষ্টিতে ই-বাণিজ্য-২..... ৩৬
মুফতী আব্দুল্লাহ নুমান
জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৪৬

মোবাইল: প্রধান সম্পাদক: ০১৮১৯৪৬৯৬৬৭, সম্পাদক:০১৮১৭০০৯৩৮৩, নির্বাহী সম্পাদক:০১৮৩৮৪২৪৬৪৭ সহকারী সম্পাদক: ০১৮৫৩৪৩৪৯৯
বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি: ০১৭১১৮০৩৪০৯, সার্কুলেশন ম্যানেজার : ০১৯৭৮৪২৪৬৪৭

সম্পাদকীয়

সাম্প্রদায়িক সংঘাত দেশ ও জাতির জন্য অশনি সংকেত

সাম্প্রদায়িক সংঘাত প্রতিটি দেশ ও জাতির জন্য একটি জঘন্য ক্ষতিকর বিষয়। এর মাধ্যমে অহেতুক রক্তপাত ঘটে, দেশ ও জাতির মধ্যে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয়। যার প্রভাবে পুরো জাতি এবং দেশ এক প্রকার অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকেই ধাবিত হয়।

এখানে বোঝার বিষয় হলো, সাম্প্রদায়িকতা কী? সাম্প্রদায়িকতার প্রায়োগিক ধারণা মানুষের সৃষ্টির শুরু থেকেই বিদ্যমান। পরিবার, গোত্র, সমাজ এবং হাল আমলের জাতীয়তা–এই ধারণাগুলোর অন্যতম একটি ভিত্তি হলো সাম্প্রদায়িকতা। মানুষ তার পরিবারকে ভালোবাসে, তাদের জন্য এক ধরনের টান অনুভব করে। পরিবারের পর বন্ধু-বান্ধবের জন্য, যে সমাজে তার বসবাস তার জন্য এবং বৃহৎ মাপকাঠিতে একটা নিজস্ব জাতীয়তা কিংবা ধর্মের জন্য ভালোবাসা বোধ করে। একটা নির্দিষ্ট গ্রুপের প্রতি মানুষের যে ভালোবাসা, টান কিংবা মিলেমিশে থাকার প্রবণতা সেটাই হলো সাম্প্রদায়িকতা। এই সাম্প্রদায়িকতা হতে পারে সামাজিক কোনো গ্রুপকেন্দ্রিক, রাজনৈতিক দলকেন্দ্রিক, অফিসকেন্দ্রিক, শহরকেন্দ্রিক, এমনকি আপনি যে গণযানবাহনে চড়ছেন, সেটা কেন্দ্রিক।

বড় দুঃখের বিষয়, ইসলাম দুশমন সম্প্রদায় এই সাম্প্রদায়িকতাকে শুধুমাত্র ধর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে দিয়ে অন্য সব ধরনের সাম্প্রদায়িকতাকে একেবারে পাক-পবিত্র করে দেওয়ার একটা কুটিল পথ ও পন্থার উদ্ভব ঘটিয়েছে। যার কারণে অন্যান্য সাম্প্রদায়িকতায় অসংখ্য রক্তপাত ঘটলেও, অগণিত তাজা প্রাণ ঝরে গেলেও তাকে সাম্প্রদায়িক সংঘাত বলে আখ্যায়িত করা হয় না। বরং অন্য নামকরণ করে সেগুলোকে হালাল বা বৈধ করে নেওয়ার একটা বিশ্বব্যাপী মানসিকতা সৃষ্টি করা হয়েছে পরিকল্পিতভাবে। তদুপরি ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে ঘৃণিত করার জন্য পরিকল্পিতাভাবেই ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে অবমাননা বা কটূক্তি করে মানুষের ধর্মীয় চেতনাকে উসকে দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সম্প্রদায় এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে একেক সময় একেকটা কৌশল অবলম্বন করে বিশেষভাবে মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনায় আঘাত হেনে তাদের অন্তরকে জর্জরিত করে আসছে দীর্ঘদিন থেকে। মুসলমানগণ তাদের আঘাতপ্রাপ্ত-জর্জরিত অন্তর নিয়ে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলে সর্বপ্রকার মিডিয়া সরব হয়ে ওঠে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। পরিকল্পনা মতে জোর প্রচারণা চালাতে থাকে সাম্প্রদায়িকতা ও উগ্রতার দোহাই দিয়ে সরাসরি ইসলামের বিরুদ্ধে। তিলকে তাল বানিয়ে প্রচার করা হয় আন্তর্জাতিক মহলেও। ইসলাম সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে দেওয়া হয় বিরূপ ধারণা।

অথচ যেকোনো সাম্প্রদায়িক সংঘাতের বিচার করতে গেলে সর্বপ্রথম দেখার বিষয় হলো, মূল উসকানিদাতা কে এবং কার ইন্ধনে এরূপ একটি পরিস্থিতি সৃষ্টির পরিবেশ তৈরি হয়েছে, তা নিশ্চিত করা।

মানুষের চেতনা ও বিশ্বাস মানবাধিকারের স্বীকৃত বিষয়। যার কারণে চেতনা-বিশ্বাসে আঘাত করা একটি জঘন্য অপরাধ। দুনিয়ায় সংঘটিত সংঘাত ও সংঘর্ষের প্রায় ক্ষেত্রে চেতনা-বিশ্বাসে আঘাতের বিষয়টি জড়িত থাকে। বরং এর মূল কারণ হয়ে থাকে এটি। তাই মানুষের চেতনা-বিশ্বাসে আঘাত হেনে তাদের অন্তরকে জর্জরিত করা মানবাধিকারের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

মুসলমানদের ওপর সাম্প্রদায়িকতা ও উগ্রতার তকমা লাগানোর হাতিয়ার হিসেবে সাম্প্রতিক বিশ্বে ধর্ম অবমাননার মাধ্যমে মুসলমানদের উসকে দিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করা হচ্ছে সর্বত্র। বাংলাদেশে বিভিন্ন নাস্তিক কর্তৃক ইসলামের বিধানাবলির অবমাননা করা, সম্প্রতি ফ্রান্স কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অবমাননাকর কার্টুন প্রচার, এর পূর্বেও বিভিন্ন দেশে ঘটে যাওয়া এরূপ কটূক্তি ও অবমাননার অমানবিক ও ইতিহাসের সর্বনিকৃষ্ট ঘটনাগুলো সবই এক সূত্রে গাঁথা। অথচ কোনো মিডিয়া বা আন্তর্জাতিক নেতারা এরূপ জঘন্য ঘটনাসমূহের নিন্দা করবে দূরের কথা, তার বিপরীত মুসলমানদের বিক্ষোভের নিন্দা জানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তাদের এসব চরিত্র থেকেই অনুমান করা যায় সাম্প্রদায়িকতাকে একমাত্র ধর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে দেওয়া বিশ্ব মুসলিম এবং ইসলামকে ঘৃণিত আকারে প্রচার করার একটি কৌশলগত হাতিয়ার মাত্র।

কিন্তু যত কৌশলই করা হোক, যত পরিকল্পনাই আঁটা হোক এতে তারা সফল হয়নি এবং হতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। কারণ বিশ্বনবী (সা.) স্বয়ং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য যে নীতিমালা প্রদান করে গেছেন, তা বিশ্ব ইতিহাসে এক অনন্য নজির। বরং ইসলাম তো শিক্ষা দেয় সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতার দুর্গ ভেঙে দিয়ে পুরো বিশ্ব একই নীতি-আদর্শের ছায়াতলে বাস করবে। যারা আজ সাম্প্রদায়িকতা বলে ইসলামকে ঘৃণিতভাবে উপস্থাপন করতে চায় তাদের কাছে এমন আদর্শ তো নেই-ই, কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ নীতিমালাও তাদের কাছে নেই। ইসলাম তো শিক্ষা দেয় যে দুনিয়ার সকল মানুষই এক আদমের সন্তান, সকলে ভাই ভাই। এখানে সাম্প্রদায়িকতা ও বর্ণবাদের কোনো স্থান নেই।

ইসলামের শিক্ষা হলো, দেশ, জাতি ও ভৌগোলিক সীমারেখার উর্ধ্বে ইসলামের পরিধি। সব মানুষই এক আল্লাহর সৃষ্টি এবং একই জাতির। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'সব মানুষ ছিল একই জাতিভুক্ত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বর পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে।' (সুরা বাকারা : ২১৩)। তাই সৃষ্টিগতভাবে সমগ্র মানবগোষ্ঠী বিশ্বভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। এ ভ্রাতৃত্ব বিশ্বমানবতার মৌলিক ভ্রাতৃত্ব। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে মানব মণ্ডলী! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদের

বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পারো।' (সুরা হুজুরাত : ১৩)। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, 'সব মানুষই আদম (আ.)-এর বংশধর, আর আদম মাটি থেকে সৃষ্ট।' (তিরমিযী)।

প্রকৃতপক্ষে সব মানুষই হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-এর সন্তান। এ হিসেবে সব মানুষ একই বংশের ও পরস্পর ভাই ভাই। রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেছেন, 'সমগ্র সৃষ্টিই আল্লাহর পরিজন।' (বায়হাকি)

বিশ্বমানবতার শান্তি প্রতিষ্ঠায় মহান আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল (আ.) পাঠিয়েছেন এবং তাঁরা সবাই মানবতার বাণী প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেছেন। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'বলুন, হে মানব মণ্ডলী! তোমাদের সবার প্রতি আমি রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।' (সুরা আরাফ : ১৫৮)। নবী-রাসূলগণের শিক্ষা ও আদর্শ নির্দিষ্ট কোনো জাতি-গোষ্ঠী ও সময়ের জন্য নয়, বরং সবার জন্য সর্বকালেই তা অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তারা বলে, আমরা তাঁর রাসূলদের মাঝে কোনো পার্থক্য করি না।' (সূরা বাকারা : ২৮৫)

তার পরও বিভিন্ন নবীর উম্মতগণ এবং বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী নিজেদের বিভিন্ন সম্প্রদায় হিসেবে প্রকাশ করে বিভক্ত হয়ে গেছে। সে ক্ষেত্রেও ইসলামী নীতিমালা অত্যন্ত স্বচ্ছ। ইসলামে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ, উপাসনালয় ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে কোনোরূপ ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে তারা (মূর্তিপূজক) ডাকে, তাদেরকে তোমরা গালি দিও না। তাহলে তারা সীমা লঙ্ঘন করে অজ্ঞানতাবশত আল্লাহকেও গালি দেবে।' (সূরা আনআম : ১০৮)

ধর্মীয় স্বাধীনতাদানের পাশাপাশি অন্যান্য সব ক্ষেত্রেই সম্প্রীতি রক্ষা করা ইসলামের অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য। সম্প্রদায় ভিন্ন হলেও মানুষ একে অন্যের সহপাঠী, সহকর্মী, শিক্ষক, প্রতিবেশী কিংবা পরিচিতজন। প্রত্যেকের ব্যাপারে একমাত্র ইসলামই ভিন্ন ভিন্ন এবং সবিস্তার ব্যাখ্যা দিয়ে সকলের যথাযথ স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করেছে। ইসলামই শিক্ষা দিয়েছে যে, প্রত্যেকের উচিত তাদের সঙ্গে সর্বদা ভালো ব্যবহার করা এবং কোনোরূপ অন্যায় আচরণ না করা। অমুসলিমদের জান-মাল-ইজ্জত সংরক্ষণের ব্যাপারে রাসূল (সা.) কঠোর সতর্কবাণী দিয়ে বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমকে হত্যা করল, সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। অথচ চল্লিশ বছরের দূরত্বে থেকেও জান্নাতের সুঘ্রাণ পাওয়া যায়।' (বোখারী)। অন্য হাদীসে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'সাবধান! যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিকের ওপর অত্যাচার করে, অথবা তার অধিকার থেকে কম দেয় কিংবা ক্ষমতাবহির্ভূতভাবে কোনো কিছু চাপিয়ে দেয় বা জোরপূর্বক তার কোনো সম্পদ নিয়ে যায় তবে কিয়ামতের দিন আমি সে (অমুসলিম) ব্যক্তির প্রতিবাদকারী হব।' (আবু দাউদ)

তদুপরি ইসলাম স্পষ্টভাবে সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার নিন্দা জানিয়ে তা পরিহার করার নির্দেশ দিয়েছে। সাম্প্রদায়িকতার নামে যারা বিশৃঙ্খলা করে তাদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে নবীজি (সা.) বলেন, 'যারা মানুষকে সাম্প্রদায়িকতার দিকে ডাকে, যারা সাম্প্রদায়িকতার জন্য যুদ্ধ করে এবং সাম্প্রদায়িকতার জন্য জীবন উৎসর্গ করে তারা আমাদের সমাজভুক্ত নয়।' (আবু দাউদ)

অন্যদিকে ইসলামে সংঘাত, সহিংসতা ও বিশৃঙ্খলার কোনো স্থান নেই। শান্তি-শৃঙ্খলার সামান্যতম লঙ্ঘন কিংবা সম্প্রীতি বিনষ্ট হওয়াকে ইসলাম কোনোভাবেই প্রশ্রয় দেয় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'বস্তুত ফেতনা-ফ্যাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ।' (সূরা বাকারা : ১৯১)। তাহলে কোনো কারণেই ইসলাম ফেতনা সমর্থন করে না, বরং ধর্মের ব্যাপারে সদাচরণ ও ইনসাফ প্রদর্শনের উৎসাহ দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের সঙ্গে সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না।' (সূরা মুমতাহিনা : ৮)।

ইসলামের এই অনন্য স্পষ্ট নীতি-আদর্শ থাকার কারণে প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালিত যাবতীয় পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হয়ে গেছে। বর্তমানে সাম্প্রদায়িকতাকে বিশেষভাবে ইসলামের সাথে সম্পর্কযুক্ত করার যে সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র চলছে, তাও নস্যাৎ হতে বাধ্য। কারণ ইসলামে কোনো বিষয়ে অস্পষ্টতা নেই।

সম্প্রতি ফ্রান্সে ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শন করে প্রিয় রাসূল বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি যে অবমাননা করা হয়েছে তার প্রতিবাদ জানানোর ভাষা আমাদের নেই। এর মাধ্যমে তারা ইতিহাসের সর্বনিকৃষ্ট এবং ঘৃণ্য কাজটি করে বিশ্বের বুকে নিজেদের সর্বনিকৃষ্ট ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক ও বর্ণবাদী বলেই পরিচয় দিয়েছে। কোনো মুসলমান যার মাঝে ঈমানী চেতনা আছে, সে ফ্রান্সের এই ঘৃণ্য কাজের নিন্দা ও ঘৃণা না করে পারে না। তাদের মধ্যে এরূপ নিকৃষ্ট সাম্প্রদায়িক মন-মানসিকতা রেখে ইসলাম এবং মুসলমানদের প্রতি সাম্প্রদায়িকতার তকমা লাগানোর ধৃষ্টতা দেখানো নিরেট পাশবিকতা ছাড়া কিছু নয়। তাদের এসব ঘটনা প্রমাণ করে, বিশ্বব্যাপী সাম্প্রদায়িকতা উসকে দিয়ে সংঘাত-সংঘর্ষ ও সন্ত্রাস সৃষ্টির মূল হোতা তারাই।

ইসলামের এমন স্পষ্ট নীতিমালা বিদ্যমান থাকার পরও অমুসলিম সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী, যারা মুসলিম দুনিয়ায় সাম্প্রদায়িক সংঘাত সৃষ্টি করে দেশ ও জাতিকে অচল করে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তাদের সামনে মুসলিম নেতৃবৃন্দের নতজানু ভূমিকা রাখার রহস্য বোধগম্য হওয়া মুশকিল। অথচ মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান ও আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দ যদি ইসলামের এসব স্পষ্ট বিষয় নিয়ে অমুসলিম সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর সামনে সামান্য শক্ত ভূমিকায় দণ্ডায়মান হয় আমাদের আশা, ইসলাম এবং মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত তাদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র নিমেষেই নস্যাৎ হয়ে যেতে বাধ্য। আল্লাহ সকলকে তাওফিক দান করুন। আমিন।

আরশাদ রহমানী
ঢাকা।
২৬/১১/২০২০ ইং

পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে

উচ্চতর তাফসীর গবেষণা বিভাগ :
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٤١) سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٤٢) وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (٤٣)

৪১। হে রাসূল! তাদের জন্য দুঃখ করবেন না, যারা দৌড়ে গিয়ে কুফরে পতিত হয়। যারা মুখে বলে আমরা মুসলমান, অথচ তাদের অন্তর মুসলমান নয় এবং যারা ইহুদি, মিথ্যা বলার জন্য তারা গুপ্তচরবৃত্তি করে। তারা অন্য দলের গুপ্তচর, যারা আপনার কাছে আসেনি। তারা বাক্যকে স্বস্থান থেকে পরিবর্তন করে। তারা বলে, যদি তোমরা এ নির্দেশ পাও, তবে কবুল করে নিও এবং যদি এ নির্দেশ না পাও, তবে বিরত থাকো। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান, তার জন্য আল্লাহর কাছে আপনি কিছু করতে পারেন না। এরা এমনিই যে আল্লাহ এদের অন্তরকে পবিত্র করতে চান না। তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়াতে লাঞ্ছনা এবং পরকালে বিরাট শাস্তি। ৪২। এরা মিথ্যা বলার জন্য গুপ্তচরবৃত্তি করে হারাম ভক্ষণ করে। অতএব তারা যদি আপনার কাছে আসে, তবে হয় তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিন, না হয় তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকুন। যদি তাদের থেকে নির্লিপ্ত থাকেন তবে তাদের সাধ্য নেই যে, আপনার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারে। যদি ফয়সালা করেন, তবে ন্যায়ভাবে ফয়সালা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালোবাসেন। ৪৩। তারা আপনাকে কেমন করে বিচারক নিয়োগ করবে অথচ তাদের কাছে তাওরাত রয়েছে। তাতে আল্লাহর নির্দেশ আছে। অতঃপর এরা পেছন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা কখনো বিশ্বাসী নয়। (মায়েদা)

গত সংখ্যার পর :

ইহুদিদের একটি বদ-অভ্যাস :

سماعون للكذب অর্থাৎ তারা মিথ্যা ও ভ্রান্ত কথাবার্তা শোনাতে অভ্যস্ত। তারা আলিম বলে কথিত বিশ্বাসঘাতক ইহুদিদেরই অন্ধ অনুসারী। তাওরাতের নির্দেশাবলির প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ দেখা সত্ত্বেও তারা তাদেরই অনুসরণ করে এবং তাদের বর্ণিত মিথ্যা ও অমূলক কিসসা-কাহিনিই শুনতে থাকে।

আলিমদের অনুসরণ করার বিধি :

যারা তাওরাত পরিবর্তন করে এবং আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশাবলিতে মিথ্যা বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে, আয়াতে তাদেরকে লক্ষ্য করে যেমন শাস্তিবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে, তেমনি ওই সব লোককেও অপরাধী বলা হয়েছে, যারা তাদেরকে অনুসরণযোগ্য সাব্যস্ত করে মিথ্যা ও ভ্রান্ত কথাবার্তা শোনায় অভ্যস্ত হয়েগেছে। এতে মুসলমানদের জন্যও একটি মৌলিক নির্দেশ রয়েছে যে আলিমদের কাছ থেকে ফাতাওয়া নেওয়ার পূর্বে তাদের যোগ্যতা সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া দরকার। দ্বীনি ইলমের ব্যাপারে অজ্ঞ জনগণের ধর্মকর্ম করার একমাত্র পথ হচ্ছে আলিমদের ফাতাওয়া ও শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করা। রুগ্‌ণ ব্যক্তি কোনো ডাক্তার অথবা হাকিমের কাছে যাওয়ার পূর্বে কী করে? পরিচিতদের কাছে খোঁজ নেয় যে এ রোগের জন্য কোন ডাক্তার পারদর্শী। কোন হাকিম বেশি ভালো? তার কী কী ডিগ্রি আছে? তার চিকিৎসাধীন রোগীদের পরিণাম কী? যথাসম্ভব খোঁজখবর নেওয়ার পরও যদি সে কোনো ভ্রান্ত ডাক্তার অথবা হাকিমের ফাঁদে পড়ে যায়, তবে বিজ্ঞজনের দৃষ্টিতে সে নিন্দার পাত্র নয়। কিন্তু যে ব্যক্তি কোনোরূপ খোঁজখবর না নিয়েই কোনো হাতুড়ে ডাক্তারের

ফাঁদে পড়ে এবং পরিণামে অর্থ ও স্বাস্থ্য উভয়ই নষ্ট করে, বিজ্ঞজনদের মতে, তার আত্মহত্যার জন্য সে নিজেই দায়ী হয়।

জনগণের ধর্মকর্মের অবস্থাও তাই। যদি তারা এলাকার বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লোকদের কাছ থেকে খোঁজখবর নিয়ে কোনো আলিমের অনুসরণ এবং তার ফাতাওয়া অনুযায়ী আমল করে, তবে তারা মানুষের কাছেও ক্ষমাযোগ্য এবং আল্লাহর কাছেও। এ জাতীয় বিষয় সম্পর্কেই রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, فان اثمه على من افتى অর্থাৎ এমতাবস্থায় আলিম ও মুফতী ভুল করলে এবং কোনো মুসলমান তার ভুল ফাতাওয়া অনুযায়ী কাজ করলে, তার গোনাহ তার ওপর নয় বরং আলিম ও মুফতীর ওপরই বর্তাবে যদি সে জেনেশুনে ভুল করে কিংবা সম্ভাব্য চিন্তা-ভাবনায় ত্রুটি করে অথবা প্রকৃতপক্ষে সে আলিম না হয়েও যদি জনগণকে ধোঁকা দিয়ে আলিম পদ দখল করে বসে থাকে।

কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি প্রয়োজনীয় খোঁজখবর না নিয়ে শুধু নিজ মতে কোনো আলিমের অনুসরণ করে এবং তার উক্তি অনুযায়ী কাজ করে অথচ সংশ্লিষ্ট আলিম অনুসরণের যোগ্য না হয় তবে এর গোনাহ এককভাবে তথাকথিত আলিম ব্যক্তিই বহন করবে না বরং অনুসরণকারীও সমান অপরাধী হবে। এমন লোকদের সম্পর্কেই কোরআন বলেছে, سماعون للكذب অর্থাৎ তারা মিথ্যা কথা শোনায় অত্যন্ত অভ্যস্ত এবং স্বীয় অনুসৃতদের ইলম, আমল ও ধার্মিকতার খোঁজখবর না নিয়েই তাদের অনুসরণে লিপ্ত।

কোরআন পাক ইহুদিদের এ অবস্থা বর্ণনা করে মুসলমানদের শুনিয়েছে যেন তারা এ দোষ থেকে আত্মরক্ষা করে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, মুসলমানরা এ ব্যাপারে উদাসীন। এ উদাসীনতাই আজকাল মুসলমানদের চরম দুরবস্থার অন্যতম কারণ। অথচ তারা বৈষয়িক ব্যাপারাদিতে খুবই হুঁশিয়ার, কর্মচঞ্চল ও সুচতুর। অসুস্থ হলে অধিকতর যোগ্য ডাক্তার বৈদ্য খোঁজ করে, মোকদ্দমা হলে নামিদামি উকিল-ব্যারিস্টার নিয়োগ করে এবং গৃহ নির্মাণ করতে হলে উৎকৃষ্ট স্থপতি ও ইঞ্জিনিয়ারের শরণাপন্ন হয়, কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে এতই উদার যে, কারো দাড়ি, কোর্তা দেখে এবং কিছু কথাবার্তা শুনেই তাকে অনুসরণযোগ্য আলিম, মুফতী ও পথপ্রদর্শক বলে নির্বাচন করে নেয়। সে নিয়মিত কোনো মাদরাসায় লেখাপড়া করেছে কি না, বিশেষজ্ঞদের সংসর্গ থেকে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেছে কি না, শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ করার অভিজ্ঞতা লাভ করেছে কি না, সাচ্চা বুজুর্গ ও আল্লাহভক্তদের সংসর্গে থেকে কিছু আত্মিক পবিত্রতা অর্জন করেছে কি না ইত্যাদি বিষয়ে খবর নেওয়ারও প্রয়োজন মনে করে না।

এর ফলশ্রুতি এই যে, মুসলমানদের মধ্যে যারা ধর্মকর্মে মনোযোগী তাদের একটি বিরাট অংশ মূর্খ ওয়ায়েজ ও ব্যবসায়ী পীরের ফাঁদে পড়ে বিশুদ্ধ ধর্মপথ থেকে দূরে সরে যায়। তাদের ধর্মীয় জ্ঞান এমন কতিপয় কিসসা-কাহিনির মধ্যে সীমাবদ্ধ, যা রৈপিক কামনা-বাসনার পরিপন্থী নয়। তারা ধর্মপথে চলছে এবং বিরাট ইবাদত করছে বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। কিন্তু কোরআনের ভাষায় তাদের স্বরূপ হচ্ছে এই :

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

অর্থাৎ তারা এমন, যাদের চেষ্টা-চরিত্র ও কাজকর্ম পার্থিব জীবনেই লুপ্ত প্রায়, অথচ তারা মনে করেছে যে চমৎকার ধর্মকর্ম করে যাচ্ছে।

মোটকথা এই যে কোরআন পাক سماعون للكذب বাক্যে মুনাফিক-ইহুদিদের অবস্থা বর্ণনা করে একটি বিরাট মূলনীতি ব্যক্ত করেছে। অর্থাৎ মূর্খ জনগণের পক্ষে আলিমদের অনুসরণ করা অপরিহার্য বটে, কিন্তু যথার্থ খোঁজখবর না নিয়ে কোনো আলিমের অনুসরণ করা ঠিক নয় এবং অজ্ঞ লোকদের মুখে মিছামিছি কথাবার্তা শোনায় অভ্যস্ত হওয়া ইচিত নয়।

ইহুদিদের দ্বিতীয় অভ্যাস :

উপরোক্ত মুনাফিকদের দ্বিতীয় অভ্যাস হচ্ছে :

سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ

অর্থাৎ এরা বাহ্যত আপনার কাছে ধর্মীয় বিষয় জিজ্ঞেস করতে এসেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধর্ম তাদের উদ্দেশ্য নয় এবং ধর্মীয় বিষয় জানার জন্যও আসেনি। বরং তারা এমন একটি ইহুদি সম্প্রদায়ের গুপ্তচর, যারা অহংকারবশত নিজেরা আপনার কাছে আসেনি। এরা শুধু তাদের বাসনা অনুযায়ী ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কে আপনার মতবাদ জেনে তাদেরকে বলে দিতে চায়। এরপর মানা-না মানা সম্পর্কে তারাই সিদ্ধান্ত নেবে। এতে মুসলমানদের জন্য হুঁশিয়ারি রয়েছে যে, আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ জানা এবং তা অনুসরণ করার

নিয়্যাতেই আলিমদের কাছে ফাতাওয়া জিজ্ঞেস করা কর্তব্য। নিজ প্রবৃত্তির অনুকূলে নির্দেশ অনুসন্ধান করার নিয়্যাতে মুফতীগণের কাছে ফাতাওয়া জিজ্ঞেস করা রিপু ও শয়তানের অনুসরণ বৈ কিছু নয়। এ থেকে বেঁচে থাকা কর্তব্য।

ইহুদিদের তৃতীয় বদ-অভ্যাস ঐশীগ্রন্থের বিকৃতি সাধন :

ইহুদিরা আল্লাহর কালামকে যথার্থ পরিবেশ থেকে সরিয়ে তার ভুল অর্থ করত এবং আল্লাহর নির্দেশকে বিকৃত করত। এ বিকৃতি ছিল দ্বিবিধ : তাওরাতের ভাষায় কিছু হেরফের করা এবং ভাষা ঠিক রেখে তৎস্থলে অযৌক্তিক ব্যাখ্যা ও পরিবর্তন করা। ইহুদিরা উভয় বিকৃতিতেই অভ্যস্ত ছিল।

এতে মুসলমানদের জন্যও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। কোরআন পাকের হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা নিজের হাতে রেখেছেন। এতে শাব্দিক পরিবর্তনের দুঃসাহস কেউ করতে পারবে না। কেননা লিখিত গ্রন্থ ছাড়াও লাখো মানুষের মস্তিষ্কে সংরক্ষিত কালামে কেউ যের-যবরের পরিবর্তন করতেই ধরা পড়ে যায়, অর্থগত পরিবর্তন বাহ্যত করা যায় এবং কেউ কেউ করেছেও। কিন্তু এর হেফাজতের জন্য আল্লাহ তা'আলার গৃহীত ব্যবস্থা এই যে, কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি সত্যপন্থী দল থাকবে, যারা হবে কোরআন ও সুন্নাহর বিশুদ্ধ অর্থবাহক। তারা পরিবর্তনকারীদের সকল দুষ্কর্ম ফাঁস করে দেবে।

চতুর্থ অভ্যাস উৎকোচ গ্রহণ :

দ্বিতীয় আয়াতে তাদের আরো একটি বদ-অভ্যাস বর্ণনা করে বলা হয়েছে, اكالون للسحت। অর্থা তারা سحت সুহত খাওয়ায় অভ্যস্ত। সুহতের শাব্দিক অর্থ কোনো বস্তুকে মূলোৎপাটিত করে ধ্বংস করে দেওয়া। এ অর্থেই কোরআনে বলা হয়েছে فيسحتكم بعذاب অর্থাৎ তোমরা কুকর্ম থেকে বিরত না হলে আল্লাহ তা'আলা আজাব দ্বারা তোমাদের মূলোৎপাটন করে দেবেন। অর্থাৎ তোমাদের মূল শিকড় ধ্বংস করে দেওয়া হবে। আলোচ্য আয়াতে সুহত বলে উৎকোচকে বোঝানো হয়েছে। হযরত আলী (রা.) ইবরাহীম নখয়ী (রহ.), মুজাহিদ, কাতাদা, যাহহাক (রহ.) প্রমুখ তাফসীরবিদ এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

উৎকোচ বা ঘুষকে সুহত বলার কারণ এই যে, এটি শুধু গ্রহীতাকেই ধ্বংস করে না, সমগ্র দেশ ও জাতিরও মূলোৎপাটন করে এবং জননিরাপত্তা ধ্বংস করে। যে দেশে অথবা যে সমাজে ঘুষ চালু হয়ে যায়, সেখানে আইনও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। অথচ আইনের ওপরই দেশ ও জাতির শান্তি নির্ভরশীল। আইন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লে কারো জানমাল ও ইজ্জত-আবরু সংরক্ষিত থাকে না। তাই ইসলামে একে সুহত আখ্যা দিয়ে কঠোরতর হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। ঘুষের উৎসমুখ বন্ধ করার উদ্দেশ্য পদস্থ কর্মচারী ও শাসকদের প্রদত্ত উপঢৌকনকেও সহীহ হাদীসে ঘুষ বলে আখ্যায়িত করে হারাম করে দেওয়া হয়েছে।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতার প্রতি অভিসম্পাত করেন এবং ওই ব্যক্তির প্রতিও যে উভয়ের মধ্যে দালালি বা মধ্যস্থতা করে। (জাসসাস)

শরীয়তের পরিভাষায় ঘুষের সংজ্ঞা এই যে, যে কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা আইনত জায়েয নয় সে কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা। উদাহরণত যে কাজ করা কোনো ব্যক্তির কর্তব্য কর্মের অন্তর্ভুক্ত সে কাজের জন্য কোনো পক্ষ থেকে বিনিময় গ্রহণ করাই ঘুষ। সরকারি কর্মকর্তা ও করণিকগণ চাকরির অধীনে স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করতে বাধ্য। এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি যদি সংশ্লিষ্ট কোনো লোকের কাছ থেকে সে কাজের বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করে তবে তাই ঘুষের অন্তর্ভুক্ত হবে। কন্যাকে পাত্রস্থ করা পিতা-মাতার দায়িত্ব। তাঁরা কারো কাছ থেকে এর বিনিময় গ্রহণ করতে পারবেন না। এখন কোনো পাত্রকে কন্যাদান করে তাঁরা যদি কিছু গ্রহণ করেন তবে তাও ঘুষ। রোযা, নামায, হজ, তিলাওয়াতে কোরআন ইত্যাদি ইবাদতও মুসলমানদের দায়িত্ব। এর জন্য কারো কাছ থেকে বিনিময় নিলে তা ঘুষ হবে। অবশ্য পরবর্তী ফিকাহবিদদের ফাতাওয়া অনুযায়ী কোরআন শিক্ষা দান করা ও নামাযের ইমামতি করা এ থেকে আলাদা।

কেউ যদি ঘুষ গ্রহণ করে ন্যায়সংগত কাজও করে দেয় তবে সে গোনাহগার হবে এবং ঘুষের অর্থও তার পক্ষে হারাম হবে। পক্ষান্তরে যদি ঘুষ গ্রহণ করে কারো অন্যায্য কাজ করে দেয়, সে উপরোক্ত গোনাহ ছাড়াও অধিকার হরণ এবং আল্লাহর নির্দেশের বিকৃতি সাধনের কঠোর অপরাধে অপরাধী হয়ে যায়।

মুসলিম দুনিয়ায় সর্বাধিক পঠিত অন্যতম কিতাব

ফাজায়েলে আমাল নিয়ে এত বিভ্রান্তি কেন-৬৯

ফাজায়েলে আমালে বর্ণিত হাদীসগুলো নিয়ে এক শ্রেণীর হাদীস গবেষকদের (!) অভিযোগ হলো, হাদীসগুলো সহীহ নয়। এগুলোর ওপর আমল করা যাবে না ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবতা কী? এরই অনুসন্ধানে এগিয়ে আসে মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা ঢাকার উচ্চতর হাদীস বিভাগের গবেষকগণ। তাঁদের গবেষণালব্ধ আলোচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছে মাসিক 'আল-আবরার'। আশা করি, এর দ্বারা নব্য গবেষকদের অভিযোগগুলোর অসারতা প্রমাণিত হবে। মুখোশ উন্মোচিত হবে হাদীসবিদ্বেষীদের।

হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীকের কাজটি আরম্ভ করা হয়েছে ফাজায়েলে যিকির থেকে। এখন ফাজায়েলে দরূদে উল্লিখিত হাদীসগুলোর নম্বর হিসেবে একটি হাদীস, এর অর্থ, তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে। উক্ত হাদীসের অধীনে হযরত শায়খুল হাদীস (রহ.) উর্দু ভাষায় যে সকল হাদীসের অনুবাদ উল্লেখ করেছেন সেগুলোর ক্ষেত্রে (ক. খ. গ. অনুসারে) বাংলা অর্থ উল্লেখপূর্বক আরবীতে মূল হাদীসটি, হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীক পেশ করা হয়েছে।

ফাজায়েলে দরূদ :

দরূদ ও সালামবিষয়ক চল্লিশ হাদীস।

হাদীস নং-২০ :

أَخْبَرَنِى أَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :السَّلاَمُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكَ صَلَّى الله عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ " :تَقُولُونَ :اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِىِّ الأُمِّىِّ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِىِّ الأُمِّىِّ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

হযরত আবু মসউদ (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে হাজির হয়ে বললেন, আসসালামু আলাইকা। সালাম সম্পর্কে তো আমরা জানলাম, আপনার ওপর দরূদ কিভাবে পাঠ করব? রাসূলুল্লাহ (সা.) কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, তোমরা এভাবে বলো :

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِىِّ الأُمِّىِّ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِىِّ الأُمِّىِّ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

(সুনানে কুবরা [নাসাঈ] ৯/২৬ হা. ৯৭৯৪)

হাদীসটির মান : হাসান

হাদীস নং-২১ (ক) :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ :حَدَّثَنِى ابْنُ الهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ :قُلْنَا :يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا التَّسْلِيمُ فَكَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ؟ قَالَ " :قُولُوا :اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ـ

وفى النووى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النبى الامى وعلى ال محمد ـ

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! সালাম সম্পর্কে তো জানলাম, দরূদ কিভাবে পড়ব? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, এভাবে বলো :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

ইমাম নববী (রহ.)-এর বর্ণনায় এভাবে রয়েছে :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النبى الامى وعلى ال محمد

(বোখারী শরীফ ৭/২২, হা. ৬৩৫৮)

হাদীসটির মান : সহীহ

হাদীস নং-২১(খ) :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَكُوْنُ لَكَ رِضاً وَلِحَقِّهِ اَدَاءً وَاَعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِىْ وَعَدْتَه وَاجْزِهِ عَنَّا مَاهُوَ اَهْلُه وَاجْزِهِ عَنَّا مِنْ اَفْضَلِ مَا جَزَيْتَ نَبِيًّا عَنْ اُمَّتِهِ وَصَلِّ عَلٰى جَمِيْعِ اِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصَّالِحِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ـ

(আল কওলুল বদী' ফিসসালাতি আলাল হাবীবিশ শফী পৃ.৭৪)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

হাদীস নং-২২ :

عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ :أَقْبَلَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَّا السَّلاَمُ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا فِى صَلاَتِنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَصَمَتَ حَتَّى أَحْبَبْنَا أَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يَسْأَلْهُ، ثُمَّ قَالَ " :إِذَا أَنْتُمْ صَلَّيْتُمْ عَلَىَّ فَقُولُوا :اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِىِّ الأُمِّىِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِىِّ الأُمِّىِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

হযরত আবু মসউদ উকবা ইবনে আমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন সাহাবী এসে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পাশে এসে বসলেন, আমরা সেখানে উপস্থিত ছিলাম। ওই সাহাবী বললেন, সালাম সম্পর্কে তো আমরা জানলাম, আপনার ওপর দরূদ কিভাবে পাঠ করব? রাসূলুল্লাহ (সা.) কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, এভাবে বলো :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِىِّ الأُمِّىِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِىِّ الأُمِّىِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيد

(সহীহে ইবনে খুজায়মা ১/৩৫১, হা. ৭১১, মুসতাদরাক [হাকেম] ১/৪১, হা. ৯৮৮, মুসনাদে আহমদ, ৪/১১৯ হা. ১৭৭৬, সহীহে ইবনে হিব্বান ৫/২৮৯, হা. ১৯৫৯, বায়হাকী ২/২০৯, হা. ২৮৪৯, দারাকুতনী ১/২৮০, হা. ১৩২৪)

হাদীসটির মান : সহীহ

হাদীস নং-২৩ :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الزَّعْفَرَانِىُّ ,ثنا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ الْخَيَّاطُ ,ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ,ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُجَاهِدٍ ,حَدَّثَنِى مُجَاهِدٌ ,حَدَّثَنِى ابْنُ أَبِى لَيْلَى ,أَوْ أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ :عَلَّمَنِى ابْنُ مَسْعُودٍ التَّشَهُّدَ وَقَالَ :عَلَّمَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ,السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ,السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ,أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ,اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ,اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَيْنَا مَعَهُمْ , صَلَوَاتُ اللَّهِ وَصَلَوَاتُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِىِّ الأُمِّىِّ , السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

হযরত আবু মা'মার (রহ.) বলেন, আমাকে হযরত ইবনে মসউদ (রা.) তাশাহহুদ শিক্ষা দিলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের এমনভাবে তাশাহহুদ শিক্ষা দিয়েছেন, যেভাবে পবিত্র কোরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তা হলো,

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ,السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ,السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ,أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ,اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ,اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَيْنَا مَعَهُمْ , صَلَوَاتُ اللَّهِ وَصَلَوَاتُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِىِّ الأُمِّىِّ , السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُه

(দারা কুতনী ১/২৭৯, হা. ১৩২৩)

হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক হক্কী হারদূয়ী (রহ.)-এর

অমূল্য বাণী

ইখলাস ছাড়া আমল মকবুল নয় :

আমলের বাহ্যিক দিক ঠিক আছে, কিন্তু অন্তর ঠিক নেই তথা ইখলাস নেই, তখনো আমল কবুল হবে না। রিয়ার একটি মশহুর হাদীস আছে। তাতে আছে কিয়ামতের দিন এক শহীদকে সামনে আনা হবে। তাঁর কাছে নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। তিনি বলবেন,

قاتلت فيك حتى استشهدت

আমি আপনার রাহে যুদ্ধ করেছি, এমনকি আমাকে শহীদ করা হয়েছে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি ভুল বলছ, তুমি আমার জন্য জিহাদ করোনি। বরং তুমি জিহাদ করেছ লোকে তোমাকে বড় বাহাদুর সাহসী বলার জন্য। যা তোমার অর্জিত হয়ে গেছে। দুনিয়াতে তোমার প্রশংসা হয়ে গেছে। তার জন্য আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ আসবে :

فسحب على وجهه حتى القى فى النار

তাকে উপুড় করে টানা হবে। শেষ পর্যন্ত আগুনে তাকে নিক্ষেপ করা হবে।

তেমনিভাবে একজন আলেমকে আনা হবে। তাঁর কাছেও সে ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে। অর্থাৎ আমি তোমাকে কী কী নিয়ামত দিয়েছি। তিনি বলবেন,

تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن

আমি ইলম অর্জন করেছি, অন্যদের শিক্ষা দিয়েছি এবং আপনার জন্যই পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত করেছি।

তদুত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলবেন,

كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارى فقد قيل

অর্থাৎ তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি তো ইলম এই জন্য অর্জন করেছিলে যে, যাতে তোমাকে আলেম বলা হয়, পবিত্র কোরআন এই জন্য শিক্ষা করেছিলে যে, যাতে তোমাকে কারী বলা হয়। সুতরাং তোমাকে আলেম এবং কারী বলা হয়েছিল। অর্থাৎ তোমার উদ্দেশ্য দুনিয়াতেই পূরণ হয়ে গেছে। এর জন্যও নির্দেশ দেওয়া হবে,

فسحب على وجهه حتى القى فى النار

তাকেও উপুড় করে ছেঁচড়ানো হবে এবং অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হবে।

পুরো হাদীসটি এরূপ :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ أَهْلِ الشَّامِ أَيُّهَا الشَّيْخُ، حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " :إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ :فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ :قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ :كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ :جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ :فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ :تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ، وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ :هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ :فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ :مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ، قَالَ :كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ :هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ- (مسلم رقم الحديث ([١٩٠٥]١٥٢)

দেখুন, জিহাদ করা কত বড় কাজ, শহীদ হওয়া কত বড় নিয়ামত, ইলম অর্জন করা এবং পবিত্র কোরআনের হিফজ করা, কারী হওয়া কত বড় বড় নিয়ামত, শরীয়তেও এসব করার নির্দেশ রয়েছে, তথাপি তা মকবুল হচ্ছে না। কেন? মৌলিক বিষয় এটিই যে, বাহ্যিক রূপ যেমন ঠিক থাকতে হবে, তেমনি অন্তরও ঠিক থাকতে হবে। ইখলাস থাকতে হবে। শরীয়তের রীতি অনুযায়ী আমল হলেও যদি ইখলাস না থাকে তবে ওই আমল মকবুল হবে না। সেই কারণেই আমি বলি, প্রত্যেক ইখলাস গ্রহণযোগ্য নয়, যদি শরীয়তের রীতিমতো আমল না হয়। আবার প্রত্যেক সহীহ আমলও মকবুল নয়, যদি ইখলাস না থাকে। আমল মকবুল হওয়ার জন্য উভয়টি আবশ্যক। আমল শরীয়ত নির্দেশিত পন্থায় হতে হবে এবং ইখলাসপূর্ণ হতে হবে।

অন্তর রুগ্‌ণ হওয়ার আলামত :

উত্তম কাজে অন্তরে খুশি সৃষ্টি হওয়া এবং খারাপ কাজে পেরেশানি সৃষ্টি হওয়া পরিপূর্ণ ঈমানের আলামত। যেমন খুশবো অনুভব করা, মিষ্টি, টক, তিতা ইত্যাদি অনুভব করতে পারা থেকে বোঝা যায় ওই লোকের ঘ্রাণশক্তি ও স্বাদ অনুভব করার শক্তি ঠিক আছে। সেই লোক সুস্থ আছে। কিন্তু যে লোকের খুশবো, মিষ্টি, তিতা, টক ইত্যাদি অনুভব করার শক্তি নেই তার ব্যাপারে বলা হবে সেই রুগ্‌ণ। বরং এ সবই বিভিন্ন রোগের আলামত। বোঝা যাবে সে-ই অসুস্থ। তেমনিভাবে যে লোকের ভালো কাজে খুশি সৃষ্টি হয় না এবং খারাপ কাজে পেরেশানি সৃষ্টি হয় না তখন বুঝতে হবে তার অন্তর রুগ্‌ণ। তার রুহানি চিকিৎসা প্রয়োজন।

ইফাদাতে

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)

বিভিন্ন সময় ছাত্র-শিক্ষক ও সালেকীনদের উদ্দেশে দেওয়া তাকরীর থেকে সংগৃহীত

তাওবাকারী আল্লাহ তা'আলার কাছে গোনাহগার নয়

হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.) বলেন, মানুষ হলো বাশার। এমন বাশার, যা ভুল-ত্রুটিতে ভরা। প্রবৃত্তির চাহিদা মতে তার বিভিন্ন ভুল হয়, গোনাহ হয়। আল্লাহ তা'আলা তাওবাকে গোনাহের প্রতিষেধক হিসেবে দান করেছেন। যখন তোমরা গোনাহ করো, তবে তৎক্ষণাৎ তাওবা করে নাও।

التائب من الذنب كمن لا ذنب له

গোনাহ থেকে তাওবাকারী এমন, যেন সে কোনো গোনাহ করেনি।

সুতরাং গোনাহ হয়ে যাওয়া অপরাধ নয়। এটি মানুষের মূল উপকরণের সাথেই জড়িত। কিন্তু গোনাহের ওপর স্থির ও জমে থাকা এবং তা থেকে তাওবা না করা অপরাধ। তাওবার কারণে প্রতিনিয়ত রেজিস্টার পরিষ্কার হতে থাকবে। যখন ওই দিক থেকে কোনো হিসাবগ্রহণকারী আসবে আপনার রেজিস্টার পরিষ্কার পাবে। কিন্তু যদি কোনো হিসাবদানকারী অলস হয়, যে এমন চিন্তা করে যে থাক, সারা মাসের হিসাব এক রাতে বসে করে ফেলব, তখন কোনো হিসাবগ্রহণকারী যদি মাস পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বিশ দিনের মধ্যে এসে বলে যে হিসাব দাও। তবে সে আটকে যাবে। তখন তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দেওয়া হবে। তার বেতন-ভাতা কেটে নেওয়া হবে। তখন তার নির্বাক তাকিয়ে থাকা ছাড়া উপায় থাকবে না।

মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময় কারো জানা নেই : মানুষের আমলের রেজিস্টার সব সময় খোলা আছে। কেউ যদি চিন্তা করে মৃত্যুর আগে আগে সব ঠিক করে নেব। এসব হলো শয়তানি কুচিন্তা। মৃত্যুর জন্য তো বৃদ্ধ হতে হবে, এমন শর্ত নেই। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকতে হবে, এমনও কথা নেই। হাজারো লোক হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক করে মৃত্যুবরণ করে। কোনো রোগ ছিল না। দীর্ঘদিন অসুস্থও ছিল না। রাত-দিন আমাদের সাথে ছিল। কথা হচ্ছিল। উঠক-বৈঠক হচ্ছিল। হঠাৎ একদিন খবর এল ওই লোক ইন্তেকাল করেছেন। সুতরাং মৃত্যুর জন্য বৃদ্ধ হতে হয় না, দুর্বল হতে হয় না। বড় বড় শক্তিশালী লোকও মরে যায়। যুবক হওয়াও জরুরি নয় বরং অনেক ছোট বাচ্চাও মরে যায়। মৃত্যু যুবক অবস্থায়ও আসে, বৃদ্ধ অবস্থায়ও আসে, অসুস্থ অবস্থায়ও আসে, সুস্থ অবস্থায়ও আসে। মোটকথা হলো, এমন চিন্তা করার কোনো সুযোগ নেই যে মৃত্যুর আগে আগে তাওবা করে নেব। বরং এরূপ চিন্তা হলো শয়তানি ওয়াসওয়াসা। শয়তানি ধোঁকা। কেউ কি জানে তার মৃত্যু কখন হবে। মৃত্যুর জন্য কি বৃদ্ধ হওয়া জরুরি? বরং আমি বলি, বৃদ্ধের তুলনায় যুবকের মৃত্যু বেশি হয়। যুবকরা বেশি মৃত্যুবরণ করে। বৃদ্ধ হওয়ার সুযোগ হয় না। এর পূর্বেই মানুষ মরে যায়। সে কারণে দুনিয়াতে বৃদ্ধের সংখ্যা কম নজরে পড়ে। বরং দুনিয়াতে যুবকই বেশি। সুতরাং শয়তানের এই ধোঁকায় না পড়া উচিত। বরং দিনের হিসাব দিনেই শেষ করা আবশ্যক। কোনো লোকের এরূপ চিন্তা করা উচিত নয় যে তাওবা আগামীকাল করব। যে আগামীকালের জন্য রেখে দিচ্ছে হতে পারে তার কালও তাওবা নসীব হবে না। তার পরের দিনও হবে না। এমন হতে হতে তার পুরো জীবনও শেষ হয়ে যেতে পারে। যখন তার মউতের ফেরেশতা হাজির হবে তখন তার আর তাওবা করার কোনোই সুযোগ থাকবে না।

হাদীস শরীফে আছে, কোনো কোনো লোক মউতের ফেরেশতাকে বলবে, সামান্য সময় দিন, যাতে আমি তাওবা করে নেব। মালাকুল মউত বলবেন, বিশাধিক প্রতিনিধি তোমার কাছে এসেছিল, কিন্তু তোমার তাওবা করার ফুরসত হয়নি। এখন তো কোনো সময় বাকি নেই। তখন ওই লোক বলবে, আমার কাছে তো কোনো প্রতিনিধি আসেনি। মালাকুল মউত বলবেন, এক-দুজন না বরং ২০ জন প্রতিনিধিই আমি পাঠিয়েছি। তারা তোমাকে বুঝিয়েছে। সে বলবে, আমার কাছে কেউ পৌঁছেনি। মালাকুল মউত বলবেন, কেন তোমার কাছে বৃদ্ধাবস্থা আসেনি। বৃদ্ধাবস্থা তো আমারই প্রতিনিধি। সে খবর নিয়ে এসেছিল তোমার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসছে। আচ্ছা, তোমার দাড়ি-গোঁফ সাদা হয়নি? এটিও তো আমার প্রতিনিধি। এটি তোমাকে জানিয়ে দিয়েছিল তোমার মৃত্যুর সময় অত্যাসন্ন। কেন তোমার নাতি কিংবা দৌহিত্র জন্মায়নি? এই নাতি-দৌহিত্র আমারই প্রতিনিধি। যারা বলছিল তোমার মুত্যুর সময় সন্নিকটে। এখন তোমার কবরে যাওয়ার সময়। এত এত প্রতিনিধির আগমনেও যখন তোমার বুঝে আসেনি,

তোমার তাওবা নসীব হয়নি, এখন তো তাওবা করার আর কোনোই অবকাশ নেই। এখন সময় চলে গেছে। যা হওয়ার হয়ে গেছে।

বন্ধুগণ, প্রতিদিনই মৃত্যুর বাজার গরম। মানুষ দুনিয়াতে আসছে আর চলে যাচ্ছে। এর মধ্যে যদি চোখ বন্ধ করে অলসতার জীবন যাপন করা হয়, তা বড়ই দুঃখের বিষয়। এটি কোনো বুদ্ধিমান লোকের কথা নয়।

من نمی گویم زیاں کن یا بیند سود باش
اے زفرصت بے خبر در ہر چہ باشی زود باش

আমি তো এটা বলছি না যে এটি করো, ওটি করো। বরং আমি বলছি, যা করার তাড়াতাড়ি করো। কারণ সময় খুব কম।

প্রতিদিন দুনিয়াতে আগমন এবং দুনিয়া থেকে প্রস্থানের ধারাবাহিকতা জারি রয়েছে। এত কিছু দেখার পরও যদি সতর্ক না হওয়া গেল, তাহলে কী করার আছে। মানুষ কি মৃত্যু দেখে সতর্ক হবে, নাকি নিজের মৃত্যু এসে যাওয়ার পর সতর্ক হবে? বরং মানুষকে সব সময় চিন্তা করতে হবে সময় চলেই আসছে। তাই সব সময় তৈরি থাকা আবশ্যক।

সর্বপ্রথম করার কাজ হলো আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির ইলম এবং মারেফাতের ইলম অর্জন করতে হবে। অর্থাৎ কী কী বিষয়ের ওপর আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে, কোন কোন বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি রয়েছে। কোন রাস্তার ওপর চললে আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হন আর কোন রাস্তার ওপর চললে আল্লাহ তা'আলা নারাজ হন। এই ইলম অর্জিত হবে শরীয়তের মাধ্যমে। এই ইলম সায়েন্স-টেকনোলজি এবং দর্শনে মিলবে না। কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় মিলবে না। যদি তা অর্জন করতে চান তবে তা মিলবে পবিত্র কোরআন-হাদীসে। ওপরে যে শিক্ষার কথা বলা হয়েছে, সবই দুনিয়াতে আরামের জন্য। কবরে আরামের জন্য নয়। কবরে যদি বিছানা থাকে তা হবে আমলের বিছানা। সেখানে উত্তম আমল রিজিক হিসেবে আবির্ভূত হবে।

হাদীস শরীফে আছে, মৃত ব্যক্তি যখন সঠিক জবাব দিতে পারবে, অর্থাৎ আল্লাহ আমার রব, আমার দ্বীন ইসলাম, আমার পয়গম্বর নবী করীম (সা.) তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দেবে ان صـــــدق عبـــدى এই বান্দা যা বলেছে সবই সত্য বলেছে।

فـافـرشـوا لـه مـن الجنة، والبسوا له من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة۔

তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছানো হোক, তার জন্য জান্নাতের লেবাস প্রদান করা হোক, তার জন্য জান্নাতের দরজাও খুলে দেওয়া হোক।

মাসিক আল-আবরারের গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলি

এজেন্ট হওয়ার নিয়ম

*	কমপক্ষে ১০ কপির এজেন্সি দেওয়া হয়।
*	২০ থেকে ৫০ কপি পর্যন্ত ১টি, ৫০ থেকে ১০০ পর্যন্ত ২টি, আনুপাতিক হারে সৌজন্য কপি দেওয়া হয়।
*	পত্রিকা ভিপিএলে পাঠানো হয়।
*	জেলাভিত্তিক এজেন্টদের প্রতি কুরিয়ারে পত্রিকা পাঠানো হয়। লেনদেন অনলাইনের মাধ্যমে করা যাবে।
*	২৫% কমিশন দেওয়া হয়।
*	এজেন্টদের থেকে অগ্রিম বা জামানত নেওয়া হয় না।
*	এজেন্টগণ যেকোনো সময় পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্ডার দিতে পারেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম
বার্ষিক চাঁদার হার

	দেশ	সাধ.ডাক	রেজি.ডাক
#	বাংলাদেশ	৩০০	৩৫০
#	সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০	১০০০
#	মধ্যপ্রাচ্য	১১৮০	১৩০০
#	মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া	১৩০০	১৫০০
#	ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া	১৬০০	১৮০০
#	আমেরিকা	১৮০০	২১০০

১ বছরের নিচে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক চাঁদা মনিঅর্ডার, সরাসরি অফিসে বা অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো যায়।

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট :

শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-৪০১৯১৩১০০০০০১২৯

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

আল-আবরার-০৮৬১২২০০০০৩১৪

হালাল খাদ্য ও 'ই-কোড' সম্পর্কিত শরঈ বিধান

শায়খুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক সাহেব (দা.বা.)

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِى الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

হে মানবসকল! তোমরা পৃথিবীর হালাল ও উত্তম খাবার ভক্ষণ করো। (সূরা বাকারা-১৬৮)

হাদীসে পাকে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّىَ بِحَرَامٍ

অর্থ : এমন দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যা হারাম আহার্য দ্বারা গঠিত হয়েছে। (মুসনাদে বায্যার, হাদীস নং-৪৩, আল মুজামুল আওসাত, হাদীস নং-৫৯৬১)

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসের দ্বারা এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে একজন মুমিন মুসলমান তার খাদ্যাভ্যাসের ক্ষেত্রে চতুষ্পদ জন্তুর মতো নয় যে কোনো ধরনের বাছ-বিচার ছাড়াই যা ভালো লাগবে, তা-ই সে খাবে। বরং তার জন্য এ বিষয়ে সচেতনতা আবশ্যক যে তার শরীরে যেন কোনো হারাম খানা প্রবেশ না করে।

খাদ্যদ্রব্য হালাল ও হারাম হওয়ার ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তে সুনির্দিষ্ট কিছু মূলনীতি আছে। আমাদের বাজারজাত পণ্যের হালাল ও হারাম নির্ধারণের আগে সে সকল মূলনীতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যক।

প্রথম মূলনীতি :

الأصل فى الحيوان الحل والأصل فى اللحوم التحريم

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে যেকোনো জীবিত প্রাণীর ব্যাপারে মূল হুকুম হলো যে তা হালাল। অর্থাৎ কোনো জীবিত প্রাণীর হালাল কিংবা হারাম কোনো একটি হুকুমের ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোনো দলিল পাওয়া না গেলে মূল হুকুমের ভিত্তিতে উক্ত প্রাণীকে হালাল মনে করা হবে এবং শরঈ পদ্ধতিতে জবাই করে কিংবা (শিকারি প্রাণী হলে) শরঈ পদ্ধতিতে শিকার করে তা খাওয়া বৈধ হবে।

الموسوعة الفقهية ١٨/٣٣٦)

"ما يتأتى أكله من الحيوان يصعب حصره، والأصل فى الجميع الحل فى الجملة إلا ما استثنى فيما يلى:

الأول الخنزير ,,,.واختلفوا فيما عداه من الحيوان :فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يحل أكل كل ذى ناب من السباع ,,, :ولا ذى مخلب من الطير الثانى :ما أمر بقتله كالحية، والعقرب، والفأرة، وكل سبع ضارٍ كالأسد، والذئب، وغيرهما مما سبق .الثالث: المستخبثات :فإن من الأصول المعتبرة فى التحليل والتحريم :الاستطابة، والاستخباث .والأصل فى ذلك قوله تعالى :(ويحرم عليهم الخبائث) ، وقوله تعالى :(يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات) " انتهى من الموسوعة

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"الأصل فى اللحوم هو الحل أو التحريم؟ فأجاب :الأصل فى اللحوم التحريم لا فى الحيوان، الأصل فى الحيوان الحل ، والأصل فى اللحوم التحريم حتى نعلم أو يغلب على ظننا أنها مباحة "....انتهى من لقاء الباب المفتوح (٩/٢٣٤) والله أعلم).

এর বিপরীতে প্রাণীর গোশতের মধ্যে এবং মৃত প্রাণীর মধ্যে মূল হুকুম হলো যে তা হারাম। অর্থাৎ কোনো মৃত প্রাণীর ব্যাপারে কিংবা গোশতের ব্যাপারে যদি সন্দেহ হয় যে এই গোশত শরঈ পদ্ধতিতে জবাই করা হয়েছে, নাকি তা মৃত জানোয়ারের গোশত?–এরূপ সন্দেহের ক্ষেত্রে মূল হুকুমের ভিত্তিতে উক্ত গোশতকে হারাম মনে করা হবে এবং তা খাওয়া বৈধ হবে না।

উল্লেখ্য, গোশতের ক্ষেত্রে মূল হুকুম হারাম হওয়া মতটির ব্যাপারে চার মাযহাবের ইমামগণ ঐকমত্য ব্যক্ত করেছেন। (হানাফী মাযহাব, হাশিয়ায়ে ইবনে আবেদীন; ৬/৪৯২, মালেকী মাযহাব, ইবনুল আরবী, আহকামুল কোরআন; ২/৩৫, শাফেয়ী মাযহাব, ইমাম নববী, শরহু সহীহি মুসলিম; ১৩/১১৬, হাম্বলী মাযহাব, ইবনে কুদামা, আল মুগনী; ১৩/১৮)

হালাল ও হারাম প্রাণীর প্রকারভেদ :

শরঈ দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে হানাফী মাযহাবে জলজ ও স্থলজ প্রাণী হালাল ও হারাম হওয়ার বিষয়টিকে ফুকাহায়ে কেরাম কয়েক ভাগে ভাগ করেছেন।

জলজ প্রাণী :

মাছ ছাড়া অন্য সকল জলজ প্রাণী হারাম। কেননা জলজ প্রাণীর মধ্যে কেবল মাছ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীকে বিভিন্ন দলিল-প্রমাণের আলোকে

শরীয়তে হারাম করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, মাছ ছাড়া অন্যান্য জলজ প্রাণী খাওয়া হারাম হলেও তা নাপাক নয়। কেননা, পানিতে জন্মগ্রহণকারী প্রাণীর মধ্যে রক্ত থাকে না। আর যে সকল প্রাণীর শরীরে রক্ত নেই, সেগুলো মরলে নাপাক নয়। কাজেই কাঁকড়া যে তেলে ভাজা হয়েছে, সে তেলে যদি মাছ ভাজা হয় (এবং তাতে কাঁকড়ার কোনো অংশ না থাকে) তবে তা খাওয়া জায়েয হবে।

স্থলজ প্রাণী :

* স্থলজ প্রাণীর মধ্যে যে সকল প্রাণীর শরীরে রক্ত নেই, তা খাওয়া জায়েয নয়। যেমন মশা, মাছি। তবে টিড্ডি ব্যতীত। কেননা টিড্ডি হালাল হওয়ার বিষয়টি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

* আর যে সকল স্থলজ প্রাণীর শরীরে রক্ত আছে, কিন্তু প্রবাহমান নয়, তা খাওয়াও বৈধ নয়। যেমন টিকটিকি।

* যে সকল স্থলজ প্রাণীর দেহে প্রবহমান রক্ত আছে, সেগুলো যদি অধিকাংশ সময় তৃণভোজী হয়, তবে সে সকল প্রাণী হালাল। চাই তা গৃহপালিত হোক বা বন্য জন্তু হোক। যেমন–গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, বকরি, দুম্বা, খরগোশ, বন্য গরু, বন্য গাধা, বন্য উট ইত্যাদি।

তবে এ সকল হালাল প্রাণীর 'গোশতের' মধ্যে মূল শরঈ বিধান যেহেতু হারাম হওয়া, কাজেই যতক্ষণ না শরঈ পদ্ধতিতে জবাই/শিকার করা হবে, ততক্ষণ তা খাওয়া জায়েয হবে না।

উল্লেখ্য, শরীয়তের দৃষ্টিতে জবাই সহীহ হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় শর্ত কয়েকটি :

১. আল্লাহর নামে 'বিসমিল্লাহ' বলে জবাই করতে হবে।

২. ধারালো অস্ত্রের মাধ্যমে খাদ্যনালি, শ্বাসনালি এবং দুই রক্তনালি–এই চার প্রকারের যেকোনো তিনটি কাটতে হবে।

৩. জবাইকারী প্রাপ্তবয়স্ক, বুঝসম্পন্ন এবং মুসলমান বা আহলে কিতাব হতে হবে। (অপ্রাপ্তবয়স্ক বাচ্চা এবং পাগল ব্যক্তি যদি এতটুকু বুঝতে সক্ষম হয় যে, 'বিসমিল্লাহ দ্বারা জবাইকৃত জানোয়ার হালাল হয় এবং জবাই হলো খাদ্যনালি, শ্বাসনালি, দুই রক্তনালির যেকোনো তিনটি কাটার নাম'তাহলে তার জবাইকৃত জানোয়ারও হালাল হবে। (ফাতহুল কাদীর; ৮/৪০৮, ইমদাদুল ফাতাওয়া; ৮/২২৭)

উল্লেখ্য, আহলে কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যে আল্লাহ তা'আলাকে বিশ্বাস করে এবং প্রকৃত খ্রিস্টধর্ম বা ইহুদি ধর্মের মৌলিক আকীদায় বিশ্বাস করে, এমন ব্যক্তি। বর্তমান বিশ্বে বাস্তবতা হলো যে, যারা নিজেদেরকে খ্রিস্টান বা ইহুদি দাবি করে থাকে, তাদের অধিকাংশই নাস্তিক! অর্থাৎ তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না। আর খ্রিস্টান ধর্ম বা ইহুদি ধর্মের সাথেও তাদের আদৌ কোনো বন্ধন নেই। তা ছাড়া জবাইয়ের ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত দুই শর্তের পাবন্দিও তারা করে না। কাজেই নামকাওয়াস্তে এ সকল খ্রিস্টান বা ইহুদিদেরকে আহলে কিতাব মনে করে তাদের জবাইকৃত গোশত খাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। (ফাতাওয়ায়ে শামী; ৬/২৯৭, মুফতী ত্বকী উসমানী দা.বা. রচিত 'বুহুস ফি কাযায়া ফিকহিয়্যাহ মুআসারাহ' গ্রন্থের أَحْكَامُ الذَّبَائِحِ وَاللُّحُومُ الْمُسْتَوْرَدَةُ প্রবন্ধ)

* আর যে সকল প্রাণী দাঁত দ্বারা কিংবা নখ দ্বারা শিকার করে খায়, তা খাওয়া জায়েয নয়। চাই তা গৃহপালিত হোক বা বন্য জন্তু হোক। যেমন–কুকুর, বিড়াল, বাঘ, সিংহ, নেকড়ে, বন বিড়াল, শিয়াল ও অন্যান্য হিংস্র প্রাণী। একই কথা পাখির ক্ষেত্রে যে, পাঞ্জা দ্বারা শিকার করে খায়, তা হারাম। যেমন–শকুন, বাজপাখি। আর যা অধিকাংশ সময় তৃণভোজী বা শস্যভোজী তা হালাল।

* যে সকল প্রাণী অধিকাংশ সময় হারাম বস্তু ভক্ষণ করে, কিংবা নাপাক বস্তু খায়, সে সকল প্রাণী খাওয়াও জায়েয নয়। যেহেতু তাতে হারামের মিশ্রণ আছে। যেমন–নাপাক-আবর্জনা খায়, এমন কাক। (হালাল ও হারাম প্রাণীর প্রকারভেদের ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন 'আল মাওসূআতুল ফিক্হিয়্যাতুল কুওয়াইতিয়্যাহ; ৫/১২৪)

একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা :

বিদেশ থেকে আমদানীকৃত গোশতের হুকুম

এ বিষয়ে একটি মূলনীতি হলো যে 'মুসলিম দেশ থেকে আমদানীকৃত হালাল প্রাণীর গোশত মুসলমানদের প্রতি সুধারণাবশত হালাল মনে করা হবে। অর্থাৎ ধরে নেওয়া হবে যে এ প্রাণীটি কোনো মুসলমান জবাই করেছে এবং হালাল পদ্ধতিতে জবাই করা হয়েছে। এর বিপরীতে যদি অমুসলিম দেশের গোশত হয়, তবে সাধারণ ধারণা মতে সে গোশত হালাল হবে না। কেননা অমুসলিমদের জবাইকৃত গোশত হালাল নয়।'

ফুকাহায়ে কেরাম যদিও উপরিউক্ত মূলনীতি উল্লেখ করেছেন, কিন্তু বর্তমানে বাস্তবতা হলো, আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যাপক চাহিদার কারণে স্বল্প সময়ে অধিক পরিমাণ প্রাণী জবাই করার নিমিত্তে রপ্তানিকারক মুসলিম-অমুসলিম সব দেশেই তৈরি হয়েছে Slaughterhouse বা যান্ত্রিক কসাইখানা। যেখানে প্রাণী জবাইয়ের প্রত্যক্ষ কর্মে কোনো মানুষের সহযোগিতা ছাড়াই আধুনিক পদ্ধতিতে মেশিনের সাহায্যে এক মুহূর্তেই হাজার হাজার প্রাণী জবাই করা হয়। কিন্তু আপত্তির বিষয় হলো, এ সকল কসাইখানায় সাধারণত জবাই সহীহ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শরঈ শর্তসমূহ লক্ষণীয় থাকে না। কেননা–

১. বেশির ভাগ কসাইখানায় বিসমিল্লাহ

সহকারে একজন মুসলমান কর্তৃক প্রত্যক্ষ জবাই সম্পাদন করা হয় না; বরং একই সাথে হাজারো মুরগি জবাই হতে থাকে, আর বেশির চেয়ে বেশি একজন মুসলমান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিসমিল্লাহ বলতে থাকে। অথচ প্রাণী হালাল হওয়ার জন্য প্রতিটি প্রাণীকে জবাইকালে ভিন্ন ভিন্নভাবে বিসমিল্লাহ বলা শর্ত।

২. অনেক কসাইখানায় মুরগিকে জবাই করার আগে ইলেকট্রিক সংযোগ সমন্বিত বরফ শীতল পানিতে ডোবানো হয়। বিশেষজ্ঞদের মত হলো যে এই ঠাণ্ডা পানিতে ৯০ পার্সেন্ট মুরগির হৃদ্‌ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়!

৩. মেশিনে ত্বরিত জবাইকালে প্রাণী হালাল হওয়ার ক্ষেত্রে যে শীরাগুলো কাটা আবশ্যক, অনেক মুরগির ক্ষেত্রেই তা যথাযথ হয় না।

৪. অমুসলিম দেশ থেকে আগত গোশতের ব্যাপারে এ সুধারণা করা সম্ভব নয় যে, কোনো মুসলমানই বিসমিল্লাহ বলে জবাই করেছে।

৫. বড় প্রাণী যেমন গরু, মহিষ ইত্যাদি জবাই করার ক্ষেত্রে আধুনিক কসাইখানাগুলোতে প্রথমে জানোয়ারকে নিষ্ক্রিয় করা হয়। নিষ্ক্রিয়করণের অনেক পদ্ধতি রয়েছে। মুসলিম বিশেষজ্ঞদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় করার সময়ই জানোয়ার মারা যায়! সে ক্ষেত্রে হাতে জবাই করলেও তা হালাল হবে না!

সারকথা, বহির্বিশ্বের মুসলিম-অমুসলিম দেশ থেকে আমদানীকৃত যেকোনো গোশতের মধ্যে উপরিউক্ত সমস্যাগুলো থাকা খুবই স্বাভাবিক। কাজেই ভোক্তাসাধারণের লক্ষণীয় হলো, আমদানীকৃত গোশত ক্রয়ের সময় যদি তা মুসলিম দেশের হয় এবং হাতে জবাইকৃত লেখা থাকে, তবে তা হালাল হবে। যদি মেশিন জবাইকৃত লেখা থাকে, তবে হারাম। যদি জবাই পদ্ধতি লেখা না থাকে, শুধু হালাল লেখা থাকে এবং তা কোনো নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানের সত্যায়নসম্বলিত হয়, তবে তা খাওয়াও জায়েয হবে।

আর অমুসলিম দেশের গোশতের ক্ষেত্রে কেবল নির্ভরযোগ্য কোনো মুসলিম সংগঠনের 'হালাল' সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে ক্রয় করা যাবে। (আমদানীকৃত গোশতের হুকুমের বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্র. মুফতী ত্বকী উসমানী দা.বা. রচিত 'বুহুস ফি কাযায়া ফিকহিয়্যাহ মুআসারাহ' গ্রন্থের أَحْكَامُ الذَّبَائِحِ وَاللُّحُومُ الْمُسْتَوْرَدَةُ প্রবন্ধ।)

দ্বিতীয় মূলনীতি :

সাধারণ খাদ্যপণ্যের মধ্যে মূল শরঈ বিধান হলো 'হালাল হওয়া'। অর্থাৎ খাদ্যপণ্য হালাল মনে করা হবে, যতক্ষণ না তাতে হারাম হওয়ার কোনো কারণ পাওয়া যায়। পবিত্র কোরআনে কারীমে মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

অর্থ : তিনিই (আল্লাহ) সেই সত্তা, যিনি পৃথিবীর সকল কিছু তোমাদের (উপকারের) জন্য সৃষ্টি করেছেন। (সূরা বাকারা; ২৯)

উল্লিখিত আয়াতের কারণে ফুকাহায়ে কেরামের মত হলো, পৃথিবীতে মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্ট সব কিছু মানুষের জন্য বৈধ। এ আয়াতের আলোকে ফুকাহায়ে কেরাম নিম্নোক্ত মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন–

أصل الاشياء الإباحة

(মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্ট) সকল বস্তুর ব্যাপারে শরীয়তের প্রথম বিধান হলো যে, তা বৈধ।

বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ আল্লামা ইবনে আবিদীন (রহ.) 'ফাতাওয়ায়ে শামী' গ্রন্থে বলেন,

مطلب المختار أن الأصل فى الأشياء الإباحة:

أقول :وصرح فى التحرير بأن المختار أن الأصل الإباحة عند الجمهور من الحنفية والشافعية اهـ

কাজেই এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, খাদ্যপণ্যও মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্ট। কাজেই প্রাণী (জীবিত) এবং অন্যান্য খাদ্যপণ্য শরীয়তের দৃষ্টিতে মৌলিকভাবে হালাল। কাজেই কোনো প্রাণী বা অন্যান্য খাদ্যপণ্য হারাম হওয়ার জন্য শরীয়তের ভিন্ন দলিল আবশ্যক হবে।

বর্তমান বাজারজাত পণ্য কি হালাল নাকি হারাম?

বর্তমান বাজারে যে সকল খাদ্যপণ্য পাওয়া যায়, উৎসের ভিত্তিতে সেগুলোর উপকরণকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন :

১. প্রাণী থেকে আহরিত উপকরণ।

২. কৃত্রিম রাসায়নিক পদার্থের উপকরণ।

৩. উদ্ভিদ থেকে আহরিত উপকরণ।

৪. অ্যালকোহল, যা মাদকদ্রব্য থেকে আহরিত হয়।

৫. মিক্সড ফুড বা প্রসেস ফুড, যা প্রাণী কিংবা অ্যালকোহলের মিশ্রণে তৈরি করা হয়।

উপরোল্লিখিত প্রথম মূলনীতির আলোকে প্রাণী থেকে আহরিত উপকরণের ব্যাপারে শরঈ বিধান হলো, যে প্রাণী থেকে আহরণ করা হয়েছে, যদি তা হারাম প্রাণী হয়, অথবা হালাল প্রাণী কিন্তু (মাছ ও টিড্ডি ব্যতীত) শরঈ পদ্ধতিতে জবাই করা হয়নি, তবে এজাতীয় প্রাণী থেকে আহরিত উপকরণ পানাহারে ব্যবহার করাও হারাম হবে।

উপরোল্লিখিত দ্বিতীয় মূলনীতির রাসায়নিক পদার্থ ও তৃতীয় উদ্ভিজ উপকরণের বিধান হলো যে, সম্পূর্ণ

হালাল, যদি তাতে নাপাকির মিশ্রণ না থাকে এবং কোনো উপায়ে তা মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর ও নেশার কারণ না হয়।

আর চতুর্থ প্রকার খাবারের ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম হলো, যে অ্যালকোহল আঙ্গুরের কাঁচা রস, কিংবা খেজুরের রস দ্বারা তৈরি করা হয়, তা নাপাক। যদ্দরুন তা খাওয়াও হারাম। কেননা তা নাপাক এবং তাতে খাদ্যপণ্য হারাম হওয়ার অন্যতম কারণ নেশাযুক্ত হওয়া Intoxication পাওয়া যায়। যেমন মদ। আর যদি আঙ্গুর কিংবা খেজুর দ্বারা তৈরীকৃত না হয়, তবে তা নাপাক নয় এবং চিকিৎসার প্রয়োজনে তা খাওয়া এবং ব্যবহার করা জায়েয হবে।

মিক্সড ফুড বা প্রসেসড ফুড

বর্তমান বাজারে এমন অনেক খাবার পাওয়া যায়, যা প্রাণী, কৃত্রিম রাসায়নিক পদার্থ, উদ্ভিদ, অ্যালকোহল–এই চার প্রকার উৎসের কোনো একটি থেকে এককভাবে তৈরি করা হয় না; বরং তা একাধিক উৎসের উপকরণ সমৃদ্ধ হয়। আলোচ্য শিরোনামে 'মিক্সড ফুড বা প্রসেসড ফুড' দ্বারা এমন খাবারই উদ্দেশ্য। ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ ইং তারিখে 'খাদ্য সংযোজন দ্রব্য ব্যবহার প্রবিধানমালা-২০১৭' শিরোনামে প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেটের বর্ণনা মতে 'খাদ্য সংযোজন দ্রব্য' অর্থ বিশেষ উদ্দেশ্যে খাদ্যের সহিত সংযোজিত কোনো বস্তু, যাহা সাধারণত মূল আহার্য হিসেবে ভক্ষণ করা হয় না, তবে বৈশিষ্ট্যসূচক উপাদান হিসেবে কারিগরি প্রয়োজনে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, প্রস্তুতকরণ, মোড়কাবৃতকরণ বা সংরক্ষণের নিমিত্তে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, প্রত্যাশিত উপযোগিতা প্রাপ্তির জন্য, খাদ্যে ব্যবহৃত হয় এবং দূষক বা অন্য কোনো মিশ্রিত পদার্থের অন্তর্ভুক্তি ব্যতিরেকেই খাদ্যের গুণগতমান অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য মূল খাদ্যের বৈশিষ্ট্যকে প্রভাবিত করে।

এ সকল খাদ্য উপকরণের 'উৎস' প্রাণী, কৃত্রিম রাসায়নিক পদার্থ, উদ্ভিদ ও অ্যালকোহল–এই চার প্রকার উৎসের কোনো একটি কিংবা একাধিক হয়ে থাকে। কাজেই কোনো খাদ্যপণ্যকে হালাল বা হারাম বলতে হলে সংযোজিত উপকরণের ভিত্তিতে নয়; বরং উপকরণের উৎসের ভিত্তিতে বলতে হবে।

মিক্সড ফুডের বিধান জানার আগে একটি মূলনীতি জানা আবশ্যক। আর তা হালো যখন হালাল খাদ্যবস্তুর মধ্যে হারাম বস্তু মিশ্রিত হবে, তখন তার হুকুম কী হবে? যেহেতু হারাম বস্তুর কারণ ভিন্ন হওয়ায় তার মিশ্রণের হুকুমও পরিবর্তন হবে। কাজেই ওই সকল মূলনীতির আলোচনাও অপরিহার্য, যেগুলোর কারণে শরীয়তে কোনো খাদ্যপণ্য হারাম করা হয়।

খাদ্যপণ্য হারাম হওয়ার শরঈ মূলনীতি :

১. مضر للصحة (Harmfulness) অর্থাৎ মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হওয়া,

অর্থাৎ কোনো জিনিস তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণে মানুষের দ্বীনের জন্য কিংবা জ্ঞান ও মস্তিষ্কের জন্য, অথবা জানের জন্য কিংবা মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হওয়ার বিষয়টি দৃঢ়ভাবে জানা যাবে, তখন তা হারাম হবে। যেমন–বিষ, যা মানুষের জানের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর, চাই তা কোনো প্রাণী থেকে আহরিত হোক বা কোনো বিষাক্ত উদ্ভিদ থেকে হোক। আরো উদাহারণ যেমন–মাটি, বালি, পাথর, ছাই ইত্যাদি। যা বিষ তো নয়, কিন্তু শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হওয়ায় হারাম।

উল্লেখ্য, কোন বস্তুটি শরীরের জন্য ক্ষতিকর, আর কোনটি ক্ষতিকর নয়, তা নির্ধারিত হবে শরীয়তের বর্ণনা দ্বারা বা ডাক্তার ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের বক্তব্য দ্বারা।

২. السكر (Intoxication), অর্থাৎ নেশাজাতীয় হওয়া।

নেশাগ্রস্ত হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মানুষের মস্তিষ্ক এবং ইন্দ্রীয়শক্তির স্বাভাবিক ক্রিয়া নষ্ট হয়ে যাওয়া।

৩. استخباث (Filthiness), অর্থাৎ সৃষ্টিগত সুস্থরুচিবোধ কর্তৃক ঘৃণিত হওয়া।

'ঘৃণিত' হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, একজন সৃষ্টিগতভাবে সুস্থরুচিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকটে কোনো বস্তুর আহার করা ঘৃণিত হওয়া। যেমন–পোকামাকড়, কীটপতঙ্গ, হিংস্র জন্তু-জানোয়ার।

৪. النجس (Impurity), অর্থাৎ নাপাক হওয়া।

চাই তার মৌলিকত্বই নাপাক হোক; যেমন রক্ত। অথবা বস্তুটি মূলত পাক কিন্তু তাতে কোনো নাপাকি মিশ্রণে তা নাপাক হয়েছে, এমন হোক; যেমন তরল ঘি, যাতে ইঁদুর পড়ে মারা যায়।

৫. كرامت (Human Dignity), অর্থাৎ মানবীয় সম্মানের অধিকারী হওয়া।

কারামাত দ্বারা উদ্দেশ্য কোনো বস্তু মানবীয় সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হওয়া। মহান আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে মানুষকে সর্বাধিক সম্মানিত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। এ কারণে মানবদেহের কোনো অংশ খাওয়া কিংবা কোনো হালাল খাদ্য বস্তুতে মিশ্রণ করা এবং তা খাওয়া সম্পূর্ণরূপে হারাম।

হাকীমুল উম্মাত থানভী (রহ.) বলেন,

جاننا چاہیے کہ شریعت مطہرہ میں استعمال

(দ্র. বেহেশতি জেওর; ৯/৯৮ মীর কুতুবখানা)

کے منع ہونے کی وجہیں چار ہیں : نجاست،،،،،،مضر ہونا،استخباث یعنی طبیعت سلیمہ کا اس سے گھن کرنا، جیسے کیڑے مکوڑے میں،اور نشہ لانا۔

কোনো জিনিস যখন স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হবে, তখন তা নাপাক হওয়া কোনো আবশ্যক নয়। যেমন বিষ, যা শরীরের জন্য ক্ষতিকর, কিন্তু এটা জরুরি নয় যে, সব বিষয়ই নাপাক হবে। তেমনি যে জিনিস নাপাক হবে, তা নেশাযুক্ত হওয়া কোনো আবশ্যক নয়। তেমনি যে জিনিস সম্মানিত হবে, তা ক্ষতিকর কিংবা নাপাক হওয়াও আবশ্যক নয়। অর্থাৎ যেকোনো বস্তু হারাম হওয়ার জন্য একাধিক কারণ যেমন থাকতে পারে, তেমনি এককভাবে কোনো একটি কারণও থাকতে পারে। –(খাদ্যপণ্য হারাম হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে বিস্তারিত দেখুন বাদায়িয়ূস সানায়ে; ১৮৬, হিন্দিয়া; ৫/৩৪, ওয়াহবাহ যুহাইলি কৃত আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু; ৪/২৫৯৪, আল মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহতুল কুওয়াইতিয়্যাহ; ৫/১২৫)

মিশ্র ফুডের শরঈ হুকুম

হারাম বস্তুর হারাম হওয়ার কারণ হিসেবে মিশ্রণের পর হালাল বস্তুর হুকুম নিম্নরূপ হবে

(সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত দলিলের জন্য পরিশিষ্ট-৫ দ্র.)

১. যদি মিশ্রিত বস্তু হারাম হওয়ার কারণ ক্ষতিকর হওয়া (Harmfulness) হয়, উক্ত বস্তু যদি কোনো হালাল বস্তুর মধ্যে মিশ্রণ করা হয়, তবে তার ক্ষতিকর দিক যদি পূর্ববৎ বহাল থাকে, তবে উক্ত হালাল বস্তুও হারাম হয়ে যাবে। আর যদি মিশ্রণের কারণে তার ক্ষতি দূর হয়ে যায় তবে উক্ত হালাল বস্তু খাওয়া জায়েয।

এ ব্যাপারে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, (বেহেশতি জেওর; ৯/৯৮)

اگر مضر چیز کا نقصان کسی طرح جاتا رہے یا مثلاً میں نشہ نہ رہے تو ممانعت بھی نہ رہیگی

এর উদাহরণ হলো যেমন–বিষ, চাই তা প্রাণী থেকে হোক বা উদ্ভিদ থেকে। বিষ যেহেতু মানব শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর, কাজেই তা হারাম। এখন যদি বিষ কোনো ওষুধের সাথে মেলানো হয় এবং তার ক্ষতিকর প্রভাব অবশিষ্ট না থাকে বরং ওষুধের জন্য উপকারী হয়, তবে তা খাওয়া হারাম হবে না।

যদি মিশ্রিত বস্তু হারাম হওয়ার কারণ কারামাত হয়, অর্থাৎ মানব শরীরের কোনো অংশ যদি কোনো হালাল বস্তুর মধ্যে মিশ্রণ করা হয়, তবে উক্ত মিশ্রণ অল্প হোক কিংবা বেশি হোক–উক্ত হালাল বস্তুও হারাম হয়ে যাবে। [প্রসিদ্ধ ফকীহ আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.)] বলেন, (দ্র. আল বাহরুর রায়িক; ১/২৪৩) جلدة آدمي إذا وقعت في الماء القليل تفسده إذا كانت قدر الظفر)

২. যদি মিশ্রিত বস্তু হারাম হওয়ার কারণ 'নেশা' হয়, তবে দেখতে হবে যে উক্ত বস্তু কি তরল নাকি শুষ্ক? যদি উক্ত নেশার বস্তুটি তরল না হয় বরং শুষ্ক হয়, তবে কোনো হালাল বস্তুর মধ্যে মিশ্রণের পর যদি তার নেশার প্রভাব দূর হয়ে গিয়ে থাকে, তবে উক্ত হালাল বস্তু খাওয়াও জায়েয হবে। আর যদি উক্ত নেশার বস্তুটি তরল হয়, তবে দুই ধরনের হতে পারে–

১. আঙ্গুর বা খেজুর দ্বারা তৈরীকৃত হারাম চার প্রকার মদের কোনো একটি হলে উক্ত হালাল বস্তুটিও হারাম হয়ে যাবে। চাই মিশ্রণ অল্প পরিমাণে হোক বা বেশি পরিমাণে এবং মিশ্রণের পর তাতে নেশার প্রভাব অবশিষ্ট থাকুক বা না থাকুক।

২. যদি তরল নেশার বস্তুটি আঙ্গুর বা খেজুরের না হয়, তবে শুষ্ক নেশার বস্তুর মতোই তার হুকুম হবে, অর্থাৎ মিশ্রণের পর যদি নেশার প্রভাব অবশিষ্ট থাকে, তবে হারাম হবে, অন্যথায় হালাল হবে।

উল্লিখিত হুকুম থেকে ওই সকল ওষুধের হুকমও বের হয়ে আসে, যাতে অ্যালকোহল মেশানো হয়ে থাকে। অর্থাৎ এ সকল ওষুধও খাওয়া হালাল হবে, যদি তাতে আঙ্গুর বা খেজুরের মদ থেকে তৈরি অ্যালকোহল না থাকে এবং তার মধ্যে নেশার কোনো প্রভাব না থাকে।

৩. যদি মিশ্রিত বস্তু হারাম হওয়ার কারণ 'ঘৃণিত হওয়া' হয়, তবে দেখতে হবে যে উক্ত বস্তু মিশ্রিত কোনো খাবারের ব্যাপারে সৃষ্টিগত সুস্থ রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিদের ঘৃণা সৃষ্টি হয় কি না? অনেক সময় 'ঘৃণাভাব' খবিশ জিনিসের সামান্য অংশের মধ্যেও হয়ে থাকে। যেমন কোনো সুস্থ রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি জানতে পারল যে বড় এক কলসি পানির মধ্যে একটি তেলাপোকা মরে পানিতে মিশে গেছে! যদিও এখানে খবিশ বস্তুর পরিমাণ কম এবং উক্ত খবিশ বস্তুর দরুন পানির রং, স্বাদ, ঘ্রাণ কোনোটিই পরিবতন হয়নি, তথাপি স্বাভাবিকভাবেই সে উক্ত পানি পান করতে ঘৃণা বোধ করবে। আবার কখনো কখনো খবিশ বস্তু কম হলে ঘৃণাভাব হয় না; বরং বেশি হলে হয়। যেমন–বড় এক ডেগ বিরিয়ানির মধ্যে একটি পিঁপড়া পড়ে গেল। খুবই স্বাভাবিক কথা যে এ খাবার খেতে কেউ ঘৃণা করবে না। কাজেই উক্ত পিঁপড়া দেখা গেলে ফেলে দিতে হবে এবং বাকি বিরিয়ানি খাওয়া জায়েয হবে।

সারকথা, কোনো হালাল খাবারের মধ্যে যদি এত সামান্য পরিমাণ 'খবিশ' বস্তু মেলানো হয়, যাতে সুস্থ রুচিসম্পন্ন ব্যক্তির ঘৃণাবোধ সৃষ্টি হয় না, তবে তা

হারাম হবে না, অন্যথায় হারাম হবে। এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য ফাতওয়াগ্রন্থ 'ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়াতে' (৫/৩৩৯) বলা হয়েছে,

دُودُ اللَّحْمِ وَقَعَ فِي مَرَقَةٍ لَا تَنْجُسُ، وَلَا يُؤْكَلُ الدُّودُ، وَكَذَا الْمَرَقَةُ إِذَا انْفَسَخَتْ الدُّودَةُ

এ ব্যাপারে হযরত থানভী (রহ.) বলেন,

اسی طرح سرکہ کو مع کیڑوں کے کھانا یا کسی معجون وغیرہ کو جس میں کیڑے پڑ گیے ہوں مع کیڑوں کے کھانا یا مٹھائی کو مع چیونٹی کے کھانا درست نہیں ہاں کیڑے نکال کر درست ہے

'খবিশ' তথা সুস্থ রুচিবোধের নিকট ঘৃণিত বস্তু মিশ্রিত মিক্সড ফুডের শরঈ হুকুম

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ফুকাহায়ে কেরামের উল্লিখিত উদাহরণগুলোতে গভীরভাবে চিন্তা করলে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, 'খবিশ' বস্তুর দ্বারা কোনো হালাল খাবার হারাম না হওয়ার ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কেরাম যে উদাহরণগুলো উল্লেখ করেছেন, তা মূলত এমন 'অনিচ্ছাকৃত ঘটনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা থেকে বেঁচে থাকা সাধারণত কষ্টসাধ্য এবং সে 'খবিশ' বস্তুর পরিমাণও যৎসামান্য!' কেননা এক ডেগ বিরিয়ানি রান্না করতে গিয়ে যদি বাতাসে উড়ে এসে একটি পিঁপড়া ডেগে পড়ে যায়, আর এ কারণে খাবারকে হারাম বলে দেওয়া হয়, তবে নিঃসন্দেহে তা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। কাজেই মানুষকে এই সাধ্যাতীত দুর্ভোগ থেকে বাঁচানোর জন্য শরীয়তে এ সামান্য পরিমাণের অবকাশ দিয়েছে।

কিন্তু চিন্তার বিষয় হলো, বর্তমানে বিভিন্ন খাবারে যে খবিশ বস্তু মেশানো হয়, তা কোনো অনিচ্ছাকৃত ঘটনা নয় এবং তা থেকে বেঁচে থাকা অসম্ভবও নয়। কেননা, উদাহরণত প্যাকেটজাত কোনো কোনো খাবারের গায়ে লেখা থাকে, E120, যা মূলত Cochineal (টকটকে লাল রঞ্জক) ও Carminic Acid (এসিড বিশেষ) বোঝায়। আর এ Cochineal ও Carminic Acid তৈরি করা হয় Insect তথা বিশেষ ধরনের একটি পোকা থেকে। এজাতীয় 'খবিশ' পোকামাকড় থেকে খাদ্য সংযোজন দ্রব্য উৎপাদন যে এখন একটি শিল্পে পরিণত হয়েছে, তা বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তিমাত্রই জানেন। তা ছাড়া Cochineal ব্যবহৃত হয় খাবারের লাল রঞ্জক হিসেবে। আর এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে যে এ রং খাবারের প্রতিটি অংশেই দৃশ্যমান হয়! কাজেই খবিশ জিনিসের পরিমাণ মিক্সড ফুডে নিতান্ত কম হওয়ার যুক্তি এখানে গ্রহণযোগ্য নয়। তৃতীয়ত, আজকাল মানুষ Carminic Acid যুক্ত খাবার খায়, কারণ সে জানে না যে এ উপকরণটি Insect থেকে তৈরি করা হয়েছে। যদি সে জানত যে তার সামনে পরিবেশিত খাবারে পিঁপড়া পিষে রং করা হয়েছে, তবে বলাই বাহুল্য যে যেকোনো সুস্থ রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি তা খেতে ঘৃণা বোধ করবে।

সারকথা, বিরিয়ানি ডেগে অনিচ্ছাকৃত পিঁপড়া পড়ে যাওয়ার উদাহরণের ওপর ভিত্তি করে বর্তমানে 'খবিশ' বস্তু মিশ্রণের এই 'খবিশ শিল্প'কে জায়েয বলার কোনো অবকাশ নেই। এ কারণেই বর্তমানে মিক্সড ফুডের মধ্যে যদি এজাতীয় কোনো পোকামাকড় বা অন্য কোনো 'খবিশ' দ্রব্য থাকে, তবে তা নিঃসন্দেহে হারাম হবে!

৪. যদি মিশ্রিত বস্তু হারাম হওয়ার কারণ নাপাকি হয়, অর্থাৎ কোনো নাপাক বস্তু কোনো হালাল বস্তুর সাথে মেশানো হয়, যেমন–শূকর, যা শরীয়তে সম্পূর্ণরূপে নাপাক। যদি হালাল তরীকায়ও শূকর জবাই করা হয়, তবুও তা পাক হবে না। কাজেই কোনো খাদ্যবস্তুর মধ্যে যদি শূকরের কোনো অংশ মিশ্রিত হয়, তবে তা সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যাবে, যদিও তাতে শূকরের রং, স্বাদ, ঘ্রাণ না থাকে।

উল্লেখ্য, কোনো খাদ্যপণ্যের মধ্যে নাপাক বস্তু, চাই নাপাকির পরিমাণ কম হোক বা বেশি–মিশ্রণ করা যেমন জায়েয নেই, তেমনি নাপাক বস্তু মিশ্রিত খাবার খাওয়াও কারো জন্য বৈধ নয় এবং এজাতীয় নাপাক বস্তুর মিশ্রণে তৈরি প্রসাধনী ব্যবহার করাও জায়েয নয়। হ্যাঁ, যখন অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে কোনো নাপাক বস্তু অল্প পরিমাণে হালাল বস্তুর মধ্যে মিশে যায় এবং এ মিশ্রণ থেকে সাধারণত বেঁচে থাকাও সম্ভব না হয় তবে নাপাক বস্তুর রং, স্বাদ ও ঘ্রাণ উক্ত হালাল বস্তুতে প্রকাশ না পাওয়ার শর্তে নাপাকি ফেলে দিয়ে উক্ত হালাল বস্তু খাওয়া জায়েয হবে। যেমন–ছাগলের দুধ দোহন করার সময় অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে তাতে ছাগলের দু-একটি লেদা পড়ে যায় এবং তা সাথে সাথে বের করে ফেলা হয়, তবে নাপাকির রং, স্বাদ, ঘ্রাণ প্রকাশ না পাওয়ার শর্তে উক্ত দুধ খাওয়া বৈধ হবে। কেননা দুধ দোহনের সময় এজাতীয় অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা থেকে বেঁচে থাকা সাধারণত কষ্টসাধ্য!

মৌলিকত্ব পরিবর্তনের পর হারাম বস্তু মিশ্রণের শরঈ হুকুম

হারাম বস্তু মিশ্রণের যে পাঁচটি সূরত ওপরে বর্ণিত হয়েছে, এ সকল হুকুম ওই সময়, যখন মৌলিকত্ব পরিবর্তন ছাড়াই কোনো হারাম বস্তুকে হালাল বস্তুতে মেশানো হয়েছে। এর বিপরীতে যদি (যেকোনো কারণে) হারাম বস্তু যখন রসায়নিক কিংবা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় তার মৌলিকত্ব বিলীন হয়ে যাওয়ার পর মেশানো হবে, কিংবা মেশানোর পর তার মৌলিকত্ব বিলীন

হয়ে যায়, তখন তার হুকুমও পরিবর্তন হয়ে যাবে। অর্থাৎ তা হালাল হয়ে যাবে।

ফুকাহায়ে কেরাম এর যে প্রকৃষ্ট উদাহরণ উল্লেখ করেছেন, তা হলো আঙ্গুর বা খেজুরের শরাব, যা নাপাক। কিন্তু এ নাপাক বস্তুটি যখন লবণ মেশানোর দরুন সিরকা হয়ে যাবে তখন পাক হয়ে যাবে। তেমনি গাধা লবণের খনিতে পড়ে লবণ হয়ে যায়, তখন উক্ত লবণ খাওয়াও জায়েয আছে। (সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত দলিলের জন্য পরিশিষ্ট-৬ দ্র.)

এখন অনুসন্ধানের বিষয় হলো যে বর্তমানে বাজারে যে সকল প্রসেস ফুড বা মিক্সড ফুড পাওয়া যায়, তাতে যে রাসায়নিক পরিবর্তনের পর হারাম বস্তু মেশানো হয়, এখানে উক্ত হারাম বস্তুর মৌলিকত্ব পরিবর্তন হয় কি না? বিষয়টি খাদ্য ও রসায়নসংশ্লিষ্ট এক্সপার্টদের মাধ্যমেই অবগত হওয়া সম্ভব। ব্যক্তিগত অনুসন্ধান ও দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের মতামতের ভিত্তিতে আমাদের অবগতি হলো যে প্রকৃতপক্ষে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় হারাম বস্তুর গুণাগুণ পরিবর্তন হয় ঠিক, কিন্তু তার মৌলিকত্ব পরিবর্তন হয় না। কাজেই হারাম বস্তুর মৌলিকত্ব পরিবর্তনের ভিত্তিতে হারাম বস্তু মিশ্রিত মিক্সড ফুডকে এককথায় হালাল বলার কোনো সুযোগ নেই।

ই-কোড সম্পর্কিত শরঈ বিধান :

আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী, প্যাকেটজাত খাদ্যদ্রবের গায়ে বেশ কিছু বিষয়ের তথ্য প্রদান করা উৎপাদনকারীর জন্য জরুরি। বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য আইন 'লেবেলিং' (লেবেলিং অর্থ লিখিত, মুদ্রিত বা গ্রাফিক্স আকারে বর্ণিত কোনো দ্রব্যের পরিচিতিমূলক বর্ণনা, যাহা লেবেলে সন্নিবেশিত বা সংযোজনের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়। দ্রষ্টব্য : 'নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন) ৮৭ ধারাতে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৯ মে, ২০১৭ তারিখে প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেট।) এর নিয়ম অনুযায়ীও প্যাকেটজাত খাদ্যপণ্যের মোড়কে খাদ্যপণ্যসংশ্লিষ্ট বিস্তারিত তথ্যাবলি উল্লেখ করা আবশ্যক। তবে অনেক সময় খাদ্য উপাদান বা খাদ্য সংযোজন দ্রব্য বোঝানোর জন্য কোড বা নম্বর ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আমাদের বাজারে প্যাকেটজাত যেসব পণ্য পাওয়া যায়, তার অনেকগুলোর লেবেলে ('লেবেল' অর্থ কোনো খাদ্যদ্রব্যের মোড়কের ওপর সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এইরূপ কোনো ট্যাগ, ব্র্যান্ড, মার্ক, চিত্র, চিহ্ন, হলমার্ক, গ্রাফিক্স বা বর্ণনামূলক নির্দেশনা, যাহা লিখিত, মুদ্রিত, সিলমোহরকৃত অথবা স্টেনসিল, অ্যাম্বোশ বা অমোচনীয় কালি দ্বারা কম্পিউটারাইজড প্রিন্টিংয়ের মাধ্যমে অথবা চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে ছাপ প্রদান করা হয় বা সংযোজন করা হয়। (সূত্র : প্রাগুক্ত)) উপাদান অংশতে কিছু "ই-কোড (E-code) বা 'ই-নম্বর' দেওয়া থাকে। এগুলো আমাদের জন্য আদৌ উপকারী নাকি ক্ষতিকর, ভোক্তাসাধারণ তা জানেন না।

এই 'ই-কোড'-এর ব্যাপারে বিপরীতমুখী বক্তব্য রয়েছে। যেমন, কারো কারো মতে, 'ই-কোডগুলো শূকরের নির্দেশ করে। অর্থাৎ 'ই-কোড' মানে হলো, সংশ্লিষ্ট খাদ্যপণ্যে শূকরের কোনো না কোনো অংশ মিশ্রণ করা হয়েছে। আর শূকর যেহেতু নাপাক, তাই খাদ্যপণ্যটিও নাপাক বিবেচিত হবে এবং তা খাওয়া ভোক্তার জন্য হালাল হবে না!'

মূলত এ বক্তব্যের ভিত্তি এ বিষয়ের ওপর যে, 'ই-কোড' মানেই হলো 'শূকরের কোনো অংশ'। কিন্তু 'ই-কোড মাত্রই শূকরের নির্দেশ করে কি না?' এ সমস্যার সমাধানকল্পে আমরা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ফাতাওয়া বিভাগ এবং হালাল ফুড এক্সপার্টদের নিয়ে গঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শরণাপন্ন হই। (তন্মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো–

১. বিশ্ববিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দের ফাতাওয়া বিভাগ।

২. পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 'জামিআতুর রশীদ, করাচির ফাতাওয়া বিভাগ এবং 'ফিকহুল হালাল' বিভাগ। যে বিভাগে হালাল ফুডের ওপর আন্তর্জাতিক বাজার বিশ্লেষণ করে গবেষণা করা হয়ে থাকে।

৩. হালাল খাদ্য ও তার সার্টিফিকেশনের ওপর গবেষণাধর্মী পাকিস্তানভিত্তিক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান Halal Foundation, Pakistan এবং

৪. হালাল খাদ্য গবেষণা বিষয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠাণ SANHA (South African National Halal Authority)

তা ছাড়া বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বের কতিপয় ডাক্তারের লেখনী থেকেও আমরা সাহায্য নিয়েছি।

ব্যক্তিগত যথাসাধ্য অনুসন্ধান এবং উল্লিখিত নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে ই-কোডের বাস্তবতা সম্পর্কে যে তথ্যাবলি আমাদের সামনে এসেছে, তা আমরা নিম্নে উল্লেখ করছি।

ই-কোড মৌলিকভাবে শূকরের নির্দেশ করে না, বরং ই-কোড মূলত European Economic Community (EEC) কর্তৃক স্বীকৃত খাদ্য সংযোজন দ্রব্য বিশেষের (রাসায়নিক বা প্রাকৃতিক খাদ্যের অংশ, রং, স্বাদ, বা রুচি বাড়ানোর উপাদান) নির্দেশিকা। যা নির্দিষ্ট কোড বা নাম্বার দিয়ে আলাদা করা হয়েছে। বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার প্রাথমিক সময়ে যখন বিভিন্ন

ধরনের খাদ্য উপাদান রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে এমনভাবে রূপান্তরিত হতো যে, তার উৎস সম্পর্কে ভোক্তার ধারণা লাভ করা সম্ভব হতো না। তখন প্যাকেটজাত খাদ্যপণ্যের গায়ে সকল খাদ্য উপাদান লেখা আবশ্যক করে দেওয়া হলো। পরবর্তীতে যখন এক দেশের পণ্য অন্য দেশে আমদানি-রপ্তানি হতে লাগল তখন বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষের সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক বাজার তৈরি হলো। ফলে অঞ্চলভিত্তিক ভাষার বিভিন্নতার দরুন প্যাকেটের গায়ে খাদ্যপণ্যের একটি নির্দিষ্ট নাম সকল অঞ্চলের মানুষের জন্য অনুধাবন করা কষ্টসাধ্য হয়ে গেল। এ অবস্থায় ভাষার বিভিন্নতায় খাদ্য সংযোজন দ্রব্য বুঝতে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনকল্পে খাদ্য সংযোজন দ্রব্যগুলোকে–যা সাধারণত প্যাটেকজাত খাবারের মধ্যে অধিকাংশ সময় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নাম না লিখে ই-কোডের মাধ্যমে প্রকাশ করা হতে লাগল। কেননা কোড বা নাম্বার সব ভাষাভাষী মানুষই বুঝতে সক্ষম ছিল।

প্রাথমিক পর্যায়ে ই-কোড নির্ধারণ করত European Economic Community (EEC)। পরবর্তীতে এর দায়িত্ব গ্রহণ করে Codex Alimentarius Commission। কোডেক্স এলিমেন্টারিয়াস কমিশন অর্থ জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক গঠিত কোডেক্স এলিমেন্টারিয়াস কমিশন কর্তৃক খাদ্য, খাদ্য উৎপাদন ও নিরাপদ খাদ্যবিষয়ক নির্ধারিত বা স্বীকৃত মান, ব্যবহারবিধি, নির্দেশনা এবং অন্য সুপারিশসম্বলিত সমন্বিত খাদ্য কোড।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১৫ মার্চ ২০১৭ তারিখে 'খাদ্য সংযোজন দ্রব্য ব্যবহার প্রবিধানমালা, ২০১৭' শিরোনামে প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেটের বর্ণনামতে বাংলাদেশেও Codex Alimentarius Commission-এর 'কোড নীতি' অনুসরণ করা হয়। কাজেই প্যাকেটজাত খাদ্যপণ্যের গায়ে ই-কোড লেখার বিষয়টি বাংলাদেশেও স্বীকৃত।

'ই-কোড' মৌলিকভাবে খাদ্য সংযোজন দ্রব্য বোঝায়। এখন জানতে হবে যে এই খাদ্য সংযোজন দ্রব্যগুলোর 'উৎস' (Source) কী? কেননা, সে উৎস হালাল হলে সংশ্লিষ্ট সংযোজিত দ্রব্যও হালাল হবে। আর সে উৎস হারাম হলে সংযোজিত দ্রব্যও হারাম হবে। কাজেই ই-কোডের ভিত্তিতে খাদ্যপণ্যের হালাল ও হারাম নির্ধারণের জন্য ই-কোড নির্দেশিত উপাদানের উৎস সম্পর্কে জানা আবশ্যক!

ই-কোডের শ্রেণীবিভাগ

ই-কোডের খাদ্য উপকরণগুলো তিন ধরনের উৎস থেকে গ্রহণ করা হয়। যথা–

১. প্রাকৃতিক উৎস থেকে প্রাপ্ত

প্রাকৃতিক উৎস যেমন–গাছ, লতাপাতা, শস্য ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন উপাদান রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পৃথক করা হয়, যা পরবর্তীতে উপাদানগুলোর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী খাবারে ব্যবহার করা হয়।

২. রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুতকৃত

প্রাকৃতিক উৎস থেকে প্রাপ্ত ই-কোডগুলো অনেক সময় ব্যয়বহুল হওয়ায় পরবর্তীতে কিছু রাসায়নিক উপাদান থেকে গ্রহণ করা হয়।

৩. প্রাণীজ উৎস থেকে প্রাপ্ত

প্রাণীজ উৎস থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন উপাদান রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পৃথক করা হয়, যা পরবর্তীতে উপাদানগুলোর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী খাবারে ব্যবহার করা হয়।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যে সকল ই-কোডের উৎস প্রাকৃতিক কোনো উদ্ভিদ কিংবা রাসায়নিক কোনো হালাল পদার্থ, সেই ই-কোডগুলো তার উৎসের ভিত্তিতে 'হালাল নির্দেশ করবে, (যদি না তাতে মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর কোনো প্রভাব, নেশা এবং নাপাকি না থাকে)। উদাহরণত E100। এটা মূলত হলুদ থেকে আহরিত রংবিশেষ। খুবই স্বাভাবিক কথা যে, উদ্ভিজ উপাদান হওয়ায় হলুদের রং কখনোই হারাম হবে না। কাজেই ব্যাপক অর্থে 'সকল ই-কোডই হারামের নির্দেশ করে'–এ দাবি বাস্তবতার আলোকে সঠিক নয়।

উৎসের ভিত্তিতে হালাল ও হারামের নির্দেশক হওয়ার ক্ষেত্রে প্রচলিত ই-কোডকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি–

১. হালাল, যে সকল ই-কোড নিশ্চিতভাবে উদ্ভিদ কিংবা রাসায়নিক হালাল বস্তু থেকে আহরিত উপাদানের নির্দেশ করে।

২. হারাম, যে সকল ই-কোড নিশ্চিতভাবে হারাম প্রাণীজ উৎস থেকে আহরিত উপাদানের নির্দেশ করে।

৩. মাশবূহ (যাতে হালাল-হারাম কোনোটাই স্পষ্ট নয়), যে সকল ই-কোডের উপাদানের উৎসে দ্বিমুখী সম্ভাবনা আছে যে, তা উদ্ভিদ কিংবা রাসায়নিক হালাল বস্তু থেকে আহরিত হতে পারে, আবার প্রাণীজ উৎস থেকেও আহরিত হতে পারে। এই ই-কোডগুলোর ব্যাপারে হারাম হওয়ার সন্দেহ এ জন্য যে এ সম্ভাবনা আছে যে সংশ্লিষ্ট ই-কোডের উপাদানটি কোনো হারাম প্রাণী থেকে নেওয়া হয়েছে। অথবা হালাল কোনো প্রাণী থেকে শরঈ জবাই ছাড়াই গ্রহণ করা হয়েছে। উভয় সুরতেই উক্ত উপাদানটি তার উৎসের কারণে হারাম হয়ে যাবে। কিন্তু যেহেতু একই সাথে এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে উক্ত উপাদানটি উদ্ভিদ উৎস বা রাসায়নিক উৎস থেকে গ্রহণ করা

হয়েছে, কাজেই নিশ্চিতভাবে এ ই-কোডগুলোকে হারাম বলা যায় না। বরং বলতে হবে যে, 'এই ই-কোডগুলো হালাল বা হারামের নির্দেশক হওয়ার ক্ষেত্রে অস্পষ্ট। আর খাদ্যপণ্যের মধ্যে যেহেতু শরীয়তের মূল হুকুম হলো হালাল হওয়া, কাজেই সে মূল হুকুমের ভিত্তিতে মাশবূহ ই-কোডযুক্ত খাবার খাওয়া জায়েয হবে। তথাপি যেহেতু অস্পষ্টতা আছে, কাজেই পারতপক্ষে উত্তম হলো এজাতীয় মাশবূহ ই-কোড থেকেও বেঁচে থাকা। প্রবন্ধের শুরুতে নীতিমালার আলোচনায় আমরা উল্লেখ করেছি যে, প্রাণীর গোশত ও অ্যালকোহল ব্যতীত অন্য খাদ্যপণ্য মৌলিকভাবে হালাল, যতক্ষণ না তাতে হারাম হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হয়। 'ই-কোড'সম্বলিত প্রসেসড ফুড যেহেতু মৌলিকভাবে হালাল, কাজেই মাশবূহ 'ই-কোড'সম্বলিত খাদ্যপণ্যের ব্যাপারেও এই হুকুম প্রযোজ্য হবে। এ ব্যাপারে ইসলামী ফিকাহশাস্ত্রের গ্রহণযোগ্য ফাতাওয়া গ্রন্থ 'ফাতাওয়ায়ে শামী'তে ফুকাহায়ে কেরামের উল্লিখিত একটি মাসআলা এখানে আলোচনা করা আবশ্যক মনে করছি।

قال ابن عابدين :في التتارخانية :من شك في إنائه أو في ثوبه أو بدن أصابته نجاسة أو لا فهو طاهر ما لم يستيقن، وكذا الآبار والحياض والجباب الموضوعة في الطرقات ويستقى منها الصغار والكبار والمسلمون والكفار؛ وكذا ما يتخذه أهل الشرك أو الجهلة من المسلمين كالسمن والخبز والأطعمة والثياب اهـ ملخصا.

উল্লিখিত মাসআলার শেষে প্রাণী ব্যতীত সাধারণ খাবার যেমন–রুটি ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে যে, যদিও অমুসলিম কিংবা দ্বীনি বিষয়ে অসচেতন কোনো মুসলমান সে খাবার তৈরি করে এবং অমুসলিম হওয়ায় কিংবা অসচেতন মুসলিম হওয়ায় এ সন্দেহ রয়েছে যে, হালাল উপায়ে হয়তো খাবার তৈরি করেনি, তথাপি এ সন্দেহ ধর্তব্য হবে না। বরং তা হালাল মনে করা হবে।

এ বিষয়ে মুফতী রশীদ আহমদ লুধয়ানভী (রহ.)-এর একটি ফাতাওয়া বিশেষভাবে লক্ষণীয়-(দ্র. আহসানুল ফাতাওয়া; ৮/১২৮)

سوال-ڈبل روٹی پر جیلی لگا کر کھاتے ہیں اسکو ناجائز کہتے ہیں- کیونکہ یہ جانور کی کھال اور ہڈی سے بنتی ہے؟ آپکی تحقیق کیا ہے؟

جواب-اولا- جیلی کا ہڈی اور کھال سے بنایا جانا ضروری نہیں، درختوں کی پتے وغیرہ سے بھی بنائی جاتی ہے، ثانیا-اگر کھال وغیرہ سے بناء گئی ہو تو یہ ضروری نہیں کہ وہ کھال مردار ہی کا ہو، حلال ذبیحہ کی کھال غالب ہے، ثالثا- جیلی کی صنعت میں تبدیل ماہیت کا احتمال بھی ہے اس صورت میں حرام جانور کی کھال سے بنائی ہوئی جیلی بھی حلال ہے، زیادہ تجسس کرنا اور احتمالات واوہام کی بنا پر احتراز کرنا دین میں تعمق وغلو ہونے کی وجہ سے ممنوع ہے، اور بلا دلیل شرعی حرمت کا حکم لگانا دین میں زیادتی اور تحریف ہے

উল্লিখিত মাসআলায় 'জেলি' (যা তৎকালীন সময়ে হালাল বস্তু থেকেও বানানো হতো আবার হারাম বস্তু থেকে বানানোরও সম্ভাবনা ছিল)-এর ব্যাপারে যেহেতু হালাল হওয়ার একটি শক্তিশালী সম্ভাবনা আছে–এর ভিত্তিতে হযরত রশীদ আহমাদ লুধিয়ানভী (রহ.) উক্ত জেলি হালাল হওয়ার ফাতাওয়া দিয়েছেন! (ই-কোডের হুকুমের মধ্যে উল্লিখিত 'মাশবূহ' শব্দটি কোনো ফিকহী পরিভাষা নয়। বরং এটি নতুন পরিভাষা, যা কোরআন-হাদীসের আলোকে বর্তমান যুগের ফিকহ বিশেষজ্ঞগণ নির্ধারণ করেছেন। এর অর্থ হলো, 'এমন বিষয়, যার হালাল হওয়া কিংবা হারাম হওয়া কোনোটাই স্পষ্ট নয় এবং এই অস্পষ্টতা স্থায়ী নয়; বরং গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে তা দূরীভূত করা সম্ভব। মাশবূহের অর্থটি বোঝার সুবিধার্থে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি উদাহরণ (তাকরীবী মেছাল) হতে পারে 'মুশকিল' পরিভাষাটি। আর 'মুশকিল'-এর হুকুম হলো চিন্তা, গবেষণা এবং তথ্য অনুসন্ধানের মাধ্যমে এ অস্পষ্টতা দূরীকরণের চেষ্টা করতে হবে। অস্পষ্টতা দূর হয়ে গেলে স্পষ্ট হুকুম মতে আমল করতে হবে। (উসূলে সারাখসী; ১/১৬৮) সুতরাং 'মাশবূহ' ই-কোডের হুকুমও এমনই। অর্থাৎ গবেষণা এবং তথ্য অনুসন্ধানের মাধ্যমে এ অস্পষ্টতা দূরীকরণের চেষ্টা করতে হবে। অস্পষ্টতা দূর হয়ে গেলে সেটাকে 'হালাল বা হারামের নির্দেশক আখ্যা দেওয়া হবে।)

ই-কোডের তালিকা

ই-কোডের তালিকা বেশ দীর্ঘ হওয়ায় আমরা সংক্ষিপ্তাকারে কেবল হারাম ই-কোডের তালিকা এখানে উল্লেখ করছি। হারাম ই-কোডগুলো (যা থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য) নিম্নরূপ–

E120, E441, E485, E542, E630, E631, E632, E633, E634, E635, E640, E904, E920, E921, E1510, E1519

বি.দ্র. উল্লিখিত হারাম ই-কোডগুলোর মধ্য হতে কিছু ই-কোডের ব্যাপারে উৎসের ক্ষেত্রে নিজ নিজ গবেষণা অনুযায়ী কেউ কেউ 'মাশবূহ'-এর মত ব্যক্ত করেছেন। তবে সতর্কতামূলক আমরা হারাম হওয়ার মতটিকেই গ্রহণ করেছি।

ই-কোডের উল্লিখিত হুকুমের সমর্থনে বিশ্ববিখ্যাত দ্বীনি বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দের ফাতাওয়াটি লক্ষণীয়,

গবেষণা বিষয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান SANHA (South African National Halal Authority-এবং পাকিস্তানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান Halal Foundation, Pakistan। (তাদের সিদ্ধান্তের কপিগুলো আমাদের কাছে সংরক্ষিত আছে।)

সাধারণ ভোক্তাদের করণীয়

আলোচ্য প্রবন্ধ পাঠের পর একজন সচেতন পাঠক মাত্রই এ বিষয়ে দ্বিধান্বিত হবেন যে, হালাল খাদ্য ও ই-কোডের ব্যাপারে আমাদের সুস্পষ্ট করণীয় কী? এ পর্যায়ে করণীয় সম্পর্কে নিবেদন হলো–

১. যদি খাদ্যপণ্য হালাল 'ই-কোড'সম্বলিত হয়, তবে খাদ্যপণ্যকে হালাল মনে করতে হবে এবং নির্দ্বিধায় তা ক্রয় করা এবং খাওয়া যাবে।

২. যদি হারাম ই-কোডসম্বলিত হয়, তবে খাদ্যপণ্য ক্রয় করা কিংবা খাওয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে থাকতে হবে।

৩. যদি মাশবূহ 'ই-কোড'সম্বলিত হয়, তবে খাদ্যপণ্যকে মৌলিকভাবে হারাম তো বলা যাবে না; তবে তাকওয়া ও পরহেজগারির দাবি হলো সন্দেহযুক্ত বস্তু থেকে বেঁচে থাকা। কাজেই পারতপক্ষে মাশবূহ 'ই-কোড'সম্বলিত খাদ্যপণ্য থেকে বেঁচে থাকাও উত্তম বিবেচিত হবে।

এতদ্বসত্ত্বেও কেউ যদি তা ক্রয় করে কিংবা খায়, তবে তা ক্রয় করা এবং খাওয়াসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য বৈধ হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া না যায়।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে খাদ্যাভ্যাসের পাশাপাশি জীবনের সকল ক্ষেত্রে হারাম থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

جواب-ای کوڈ اشیاء میں شامل غذائی اجزاء اور غذائی اضافات کی علامت ہے-یہ غذائی اجزاء اور غذائی اضافات نباتات اور جانوروں سے حاصل کیے جاتے ہیں-اگر یہ نباتات سے ماخوذ ہوتو شرط یہ ہے کہ یہ مضراور نشہ آور نہ ہوں-اوراگر جانوروں سے حاصل کردہ ہوتو شرط یہ ہے کہ جانور حلال ہو نیز انہیں شرعی طریقہ سے ذبح کیا گیا ہو-

اگر کسی مصنوع میں شرائط مذکورہ کے حامل غذائی اجزاء اور غذائی اضافات کے ای کوڈز شامل ہوتو وہ ای کوڈز حلال ہوگی ورنہ حرام شمار ہوگی-

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہوگئی کہ ہرای کوڈ مصنوع کے حرام ہونے پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ اس کے بارے میں تفصیل مذکور کے مطابق معلوم کیا جائیگا کہ وہ ای کوڈ کس غذائی جزو کی علامت ہے اور وہ غذائی جزو حلال ہے یا حرام؟-جامعۃ الرشید , کراتشی, باکستان-فتوی نمبر:۵۸/۶۵۳۵۴)

ই-কোডের প্রশ্নের জবাবে জামিআতুর রশীদ করাচির উল্লিখিত জবাবের সারসংক্ষেপ হলো, 'ই-কোড মূলত খাদ্য উপাদান-উপকরণের নির্দেশিকা। এ খাদ্য উপাদান কখনো তো উদ্ভিদ থেকে নেওয়া হয়, আবার কখনো তা প্রাণী থেকে নেওয়া হয়। উদ্ভিদ থেকে নেওয়া হলে শর্ত হলো, স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং নেশাজাতীয় না হওয়া। আর প্রাণী থেকে নেওয়া হলে শর্ত হলো হালাল পদ্ধতিতে জবাই করা। মোটকথা, ই-কোড মানেই হারাম নয়; বরং হালাল-হারামের বিষয়টি নির্ভর করবে কোড নির্দেশিত উপাদানের ওপর..!'

ই-কোডের উল্লিখিত হুকুমের সমর্থনে একই মত ব্যক্ত করেছেন হালাল খাদ্য

سوال-یہ سوال پہلے پوچھے گئے ایک سوال کے تعلق سے ہے کہ آیا انڈیا کی کھانے کی مصنوعات جن پرای کوڈ ہوتا ہے اس میں سور کی چربی شامل ہوتی ہے؟یہ بہت تشویشناک معاملات ہے دارالعلوم دیوبنداس معاملہ میں کیوں خاموش ہے؟ مجھے امید ہے کہ اس مرتبہ مجھے اطمینان بخش جواب ملیگا

جواب-فقہ کا ضابطہ ہے کہ "الاصل فی الاشیاء الاباحہ "چیزوں کے اندر اباحت ہے جبتک ہمیں پوری پختگی کے ساتھ یہ معلوم نہ ہوجاے کہ حرمت کا کونسا پہلواس میں موجود ہے تب تک کوئی حتمی راے ہم قائم نہیں کر سکتے۔اور محض شک کی وجہ سے کسی چیز کو حرام کہ دینا شریعت کے اصول کے خلاف ہے آپ اپنی ذاتی حد تک احتیاط برت سکتے ہیں -فتوی نمبر:۱۷۴۶=۲۱۳۹ب)

ই-কোডের প্রশ্নের জবাবে দারুল উলূম দেওবন্দের পক্ষ হতে উল্লিখিত জবাবে বলা হয়েছে যে, মৌলিকভাবে খাদ্যপণ্য যেহেতু হালাল, কাজেই স্বাভাবিক অবস্থায় এ মূলনীতির আলোকে খাদ্যপণ্যকে হালাল মনে করা হবে, যতক্ষণ না হারাম হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে জানা যায়।

ই-কোডের উল্লিখিত হুকুমের সমর্থনে পাকিস্তানের বিখ্যাত দ্বীনি বিদ্যাপীঠ জামিআতুর রশীদ করাচির ফাতাওয়াটি লক্ষণীয়–

سوال - کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کھانے پینے کی اشیاء جو ای کوڈ کے نام سے استعمال ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس میں خنزیر کی چربی استعمال ہوتی ہے بندہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ بات کس حد تک درست ہے؟

আকাবিরে দেওবন্দের ওপর আরোপিত অভিযোগগুলোর সমুচিত জবাব ও সন্দেহের নিরসন-২

মূল : হাকিমূল ইসলাম কারী মুহাম্মদ তৈয়ব (রহ.)
অনুবাদ : মাওলানা সলীম উদ্দীন মাহদী কাসেমী

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (রহ.)-এর ওপর আরোপিত অভিযোগ ও তার জবাব

প্রশ্ন নং-২ :

"হুসামুল হারামাইন" কিতাবে রয়েছে যে, হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (রহ.) (চিশতি, নকশবন্দি, সোহরাওয়ার্দী, কাদেরী) লিখেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা মিথ্যা বলেন।

উত্তর নং-২ :

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (রহ.)-এর ফাতাওয়া তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে এবং কয়েকবার প্রকাশিত হয়েছে। ওই সকল ফাতাওয়ার অধ্যায় বিন্যাস করে একত্রিত করে "ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়া" নামে প্রকাশ করা হয়েছে। আপনি দেখতে পাবেন, তাতে নিম্ন প্রশ্নের সমাধান দেওয়া হয়েছে।

সমস্যা : আল্লাহ তা'আলা 'মিথ্যা'র গুণে গুণান্বিত হতে পারেন কি না? এবং মহান প্রভু মিথ্যা বলেন কি না? কোনো ব্যক্তি যদি মনে করে 'আল্লাহ মিথ্যা বলেন' তার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত কী? সম্মানিত মুফতী সাহেবান! অনুগ্রহ করে সমাধান জানিয়ে উপকৃত করবেন।

সমাধান : মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মিথ্যার সাথে গুণান্বিত হওয়া থেকে মুক্ত। (আল্লাহ রক্ষা করুন) তাঁর কালাম ও বার্তায় কোনো ধরনের মিথ্যার সম্ভাবনা নেই।

আল্লাহ বলেন, ومن اصدق من الله قيلا যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে এমন আকিদা-বিশ্বাস পোষণ করে, অথবা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে যে "আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারেন" সে অবশ্যই কাফের, অভিশপ্ত এবং কোরআন-হাদীস ও ইজমার বিরোধিতাকারী। সে কখনো মুমিন হতে পারে না।

تعالى عمايقول الظالمون علواكبيرا

(ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়া, পৃ. ৯০)

তাঁরা যে বিষয় টেনে হযরত গাংগুহী (রহ.)-এর ওপর এই ডাহা মিথ্যা অপবাদ দিয়েছেন তা হলো হযরত গাংগুহী (রহ.)-এর এই কথাটি। মাওলানা (রহ.) লিখেছেন, যাদের নাম নিয়ে আল্লাহ বলেছেন যে, এরা দোজখে যাবে তাদেরকে অবশ্যই দোযখে পাঠাবেন, কিন্তু তাঁর কাছে এই ক্ষমতা অবশ্যই রয়েছে যে, তিনি তাদেরকেও জান্নাতে দিতে পারেন। তিনি এমন বাধ্য নন যে তাদেরকে জাহান্নামেই পাঠাতে হবে।

এই বিষয়টি কোরআন দ্বারা প্রমাণিত। এটি উম্মতের উলামায়ে কেরামের আকিদা-বিশ্বাস। তাফসীরে বায়জাভী শরীফে বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। মক্কা শরীফের উলামায়ে কেরামগণও তা সত্যায়ন করেছেন। হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহ.) এটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন এবং তার প্রমাণে কোরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি পেশ করেছেন। এ সব কিছু ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়ায় উল্লেখ রয়েছে।

আলা হযরত এ সকল সত্য কথা দলিল-প্রমাণ দ্বারা ভুল প্রমাণ করতে অক্ষম ছিলেন, তাই তিনি এই "শক্তির ব্যাপকতা"র শিরোনাম পরিবর্তন করে "মিথ্যা বলার" শিরোনাম দিয়ে প্রচার করতে লাগল যে হযরত গাংগুহী (রহ.)-এর বিশ্বাস হলো (নাউযুবিল্লাহ) "আল্লাহ তা'আলা মিথ্যা বলেন। যেন প্রতারণার মাধ্যমে সাধারণ মুসলমানদের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়াতে পারেন।

যখন হযরত গাংগুহী (রহ.)-এর নিকট এই অপবাদের সংবাদ পৌঁছল তখন তিনি এই মিথ্যা অপবাদ স্পষ্টভাবে নাকচ করে দিয়েছেন। সেই ব্যাপারে হযরত গাংগুহী (রহ.)-এর স্পষ্ট বক্তব্য ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়ার ৮৪ নং দ্রষ্টব্য। তাতে রয়েছে, 'অধমের সকল বন্ধুর আকিদা-বিশ্বাসও তাই। হয়তো শত্রুরা অন্যভাবে তার বিবরণ দিয়েছে।'

হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.)-ওপর আরোপিত অভিযোগ ও তার জবাব

প্রশ্ন নং-৩ :

"হুসামুল হারামাইন" কিতাবে রয়েছে যে হযরত মাওলানা খলীল আহমদ আম্বিটভী (রহ.) (চিশতি, নকশবন্দি, সোহরাওয়ার্দী, কাদেরী) "বরাহীনে কা'তিয়া" নামক কিতাবে লিখেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জ্ঞানের চেয়ে শয়তানের জ্ঞান বেশি।

উত্তর নং-৩ :

হযরত মাওলানা খলীল আহমদ আম্বিটভী সাহারানপুরী সাহেব (রহ.)-এর ওপর আপত্তি যে, তিনি "বরাহীনে কা'তিয়া" নামক পুস্তিকায় লিখেছেন যে, শয়তানের জ্ঞান রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জ্ঞানের চেয়েও অধিক। এটি সরাসরি মিথ্যা অপবাদ।

প্রকৃত বিষয় হলো, মিলাদ মাহফিলে যাঁরা কিয়াম করেন তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলো এই কিয়াম তাঁরা কার সম্মানে করেন? তখন তারা বলল, এমন মাহফিলে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাশরীফ আনেন। অতঃপর তাদের জিজ্ঞাসা করা হলো, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে তাশরীফ আনেন তার কোনো প্রমাণ আছে কি? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি বলেছেন যে যেখানেই মিলাদ মাহফিল হয় আমি সেখানে উপস্থিত হই? যদি এমন কোনো হাদীস থাকে উদ্ধৃতি দেওয়া উচিত ও সনদ উল্লেখ করা সমুচিত। যদি উদ্ধৃতি দিতে না পারে তাহলে এটি অশুদ্ধ ও ভুল আকিদা এবং মিলাদ মাহফিলে উপস্থিতির কথা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা রাসূলের ওপর মিথ্যারোপ করা ও শরীয়তের অতিরিক্ত বিষয় সংযুক্ত করা। হাদীস শরীফে এসেছে, من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار যে ব্যক্তি জেনেশুনে আমার ওপর মিথ্যারোপ করবে তার স্থান হলো জাহান্নাম। সুতারাং এমন অবাস্তব আকিদা-বিশ্বাস থেকে তাওবা করা জরুরি।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, যদি মেনে নেওয়া হয় যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপস্থিত হন, তাহলে একই সময়ে একাধিক স্থানে অনেকগুলো মাহফিল হয়ে থাকে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোথায় উপস্থিত হবেন? তারা (রেজাখানীরা) কোনো হাদীস পেশ করতে পারেনি। কেননা এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কোনো হাদীস নেই। কিন্তু অন্য বিষয়ের এমন একটি উত্তর দিল, যা কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি বা কোনো দ্বীনদারের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। বরং যার সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সামান্যতম সম্পর্ক থাকবে তার মনে এমন জবাবের কল্পনা এলেও সে প্রকম্পিত হয়ে উঠবে। যা লিখতে কলম কাঁপছে ও বুক দুরু দুরু করছে। জবাবটি ছিল এই, "শয়তান তো মাহফিলে উপস্থিত হয়ে যায়, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি উপস্থিত হতে পারেন না?"

হাদীস শরীফ পেশ করা তো দূরের কথা, তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে শয়তানের ওপর অনুমান করে বাঁচার আশ্রয় নিয়েছে। যখন যেখানে শয়তান উপস্থিত হয় যেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও এভাবে উপস্থিত হয়ে থাকেন। আস্তাগফিরুল্লাহ। যার বক্ষে আত্মসম্মান বোধসম্পন্ন অন্তর রয়েছে সে রাসূলের শানের বিপরীত এমন কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য কিভাবে সহ্য করতে পারবে?

হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহেব (রহ.) যে উত্তর লিখেছেন তার সারাংশ হলো, শয়তানকে তো পথভ্রষ্ট করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সে যেকোনো অপবিত্র স্থান, মদের আড্ডা, ব্যভিচার ও মূর্তিখানায় পৌঁছে যায়, বাথরুমে সবার সাথে প্রবেশ করে, হ্যাঁ, যে দু'আ পড়ে প্রবেশ করেবে সে তার অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাবে। মানুষের রগ-রেষায় রক্তের ন্যায় মিশে যায়। সমুদ্রে নিজের সিংহাসন বসায় এবং তার সৈন্যরা সেখানে আসে নিজেদের কারগুজারি শোনায়। আখিরাতে কিন্তু তাকে জাহান্নামে যেতে হবে, সে সদা-সর্বদা শাস্তিতে নিমজ্জিত থাকবে ইত্যাদি।

উপরোল্লিখিত বিষয় সম্পর্কে অনেক হাদীস রয়েছে। কিন্তু একটি অপবিত্র কিয়াস-অনুমান ব্যতীত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহফিলে তাশরীফ আনা সম্পর্কে কোনো হাদীস বা দলিল কি তাদের আছে?

মোটকথা হলো, যেখানে যেখানে শয়তানের গমন-আগমনের কথা হাদীস শরীফে রয়েছে শয়তানের ওপর অনুমান করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ওই স্থানে

গমনাগমনের দাবি নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর সরাসরি মিথ্যারোপ এবং তাঁকে অপমান করার শামিল। আল্লাহ আমাদের সকলকে এমন ঘৃণিত অবাস্তব আকিদা-বিশ্বাস থেকে হেফাজত করুন।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, মাওলানা আহমদ রেজা খান সাহেব রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিভিন্ন স্থানে উপস্থিতির ওপর এই অবাস্তব প্রমাণ কোত্থেকে সংগ্রহ করলেন? অথচ আকিদা প্রমাণ করার জন্য "নুসুসে কতয়ীয়া" বা অকাট্য দলিল পেশ করা অত্যাবশ্যকীয়। এটি না পাওয়া গেলে সুস্পষ্ট হাদীস পাওয়া জরুরি। এটি না হলে অন্তত কিয়াসের জন্য একটি উত্তম দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা জরুরি ছিল। মাওলানা অন্য কিছু না পেয়ে শয়তানের সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে তুলনা করলেন, নাউযুবিল্লাহ। এর ওপর "ইন্নালিল্লাহ" পড়া ব্যতীত আর কী করা যায়?

কিয়াম সম্পর্কে বাস্তব কথা হলো, এটি এমন একটি কাজ, যা আত্মহারা অবস্থায় সংগঠিত হয় এবং যা পুণ্যাত্মা 'সাহেবে হাল' আল্লাহওয়ালাদের হয়ে থাকে, তাঁরা সে ক্ষেত্রে অপারগ ধর্তব্য হন, তার ওপর তাঁদেরকে তিরস্কারও করা যায় না, তবে এই বিধান সকলের জন্য নয়। যখন তা শরীয়তের মাসআলা হিসেবে পেশ করা হবে তখন তার পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করা জরুরি হবে। তাই এ সম্পর্কে আমরা যে প্রমাণ পেয়ে থাকি তা হলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা অপছন্দ করতেন এবং তিনি তার অনুমতি দেননি। হযরত আনাস (রা.) বলেন, সাহাবায়ে কেরামের নিকট রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চেয়ে অধিক প্রিয় কোনো ব্যক্তি ছিল না। কিন্তু তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে দেখে "কিয়াম" করতেন না। কেননা তাঁরা জানতেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) "কিয়াম" করাকে অপছন্দ করতেন।

হাদীসের মূলপাঠ :

عَنْ أَنَس قَالَ "لَمْ يَكُنْ شَخْص أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَته لِذَلِكَ "قَالَ التِّرْمِذِيّ هذا حديث حَسَن صَحِيح غَرِيب ،

সাহাবায়ে কেরাম এই অপছন্দের ব্যাপারে এভাবে অবগত হন যে, একদিন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লাঠির ওপর ভর দিয়ে রুম থেকে বের হলেন। তাঁকে দেখামাত্রই ভালোবাসার তাড়নায় সকলে দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, দাঁড়িয়ে সম্মান জানানো তো অনারবদের স্বভাব, তোমরা তা গ্রহণ কোরো না।

হাদীসের মূলপাঠ :

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ :خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الْأَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا .

(سنن أبى داود)

অন্য হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি নিজের জন্য এটি পছন্দ করে যে, তার সম্মানার্থে মানুষ দাঁড়িয়ে যাক সে নিজের স্থান জাহান্নামে করে নিল। (আবু দাউদ, তিরমিযী)।

হাদীসের মূলপাঠ :

قَالَ :خَرَجَ مُعَاوِيَةُ، فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ صَفْوَانَ حِينَ رَأَوْهُ .فَقَالَ: اجْلِسَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (رواه الترمذى)

কিয়াম সম্পর্কীয় এই তিনটি হাদীস মিশকাত শরীফে প্রথম খণ্ডের ৪০৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে। এই সকল আলোচনা ছিল প্রচলিত কিয়াম সম্পর্কে। চিন্তা করুন যে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপন মজলিসে পছন্দ করেননি তা তাঁর ইন্তেকালের পর আপনাদের মজলিসে এই ধারণাপ্রসূত আগমনের ওপর কিভাবে পছন্দ করতে পারেন? তার পরও যদি তার পক্ষে কোনো রেওয়াত বা বর্ণনা পাওয়া যেত তাহলে তা মাথা পেতে নেওয়া যেত। কিন্তু যখন এমন কোনো বর্ণনা নেই তাহলে কেবলমাত্র ধারণাকৃত অনুমান ও অবাস্তব কিয়াসের ওপর ভিত্তি করে আকিদা হিসেবে প্রমাণ করার অধিকার কি কারো থাকতে পারে?

নিজের এসলাহ সবার আগে

মূল : শায়খুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মদ তকী উসমানী
অনুবাদ : মাওলানা সুহাইলুল কাদের ফয়জী

সকল প্রশংসা পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর, যিনি দুনিয়ার বুকে সত্যের বাণী উচ্চকিত করেছেন।

'বর্তমান সময় অনেক খারাপ', 'মানুষের অন্তর থেকে আমানত ও দিয়ানত উঠে গেছে', 'সুদের বাজার গরম', 'ঘুষ ও সুপারিশ ছাড়া দপ্তরে কোনো কাজ হয় না', 'প্রত্যেকে অধিক থেকে অধিকতর সম্পদশালী হওয়ার ফিকিরে আছে', 'শরাফত ও আখলাকের মৃত্যু হয়েছে বহু আগে', 'বদদ্বীনির সয়লাব চতুর্দিক বেষ্টন করে নিয়েছে', 'মানুষ আল্লাহ ও আখেরাত থেকে উদাস হয়ে আছে।'

দিনে-রাতে এ রকম বাক্য আমরা অনেক বলি ও শুনি। সম্ভবত আমাদের কোনো মজলিস-আলোচনা উক্ত অভিযোগ থেকে খালি হয় না। অভিযোগগুলো যুক্তিসঙ্গত। মূলত জীবনের যেদিকেই দৃষ্টিপাত করি, কেবল অধঃপতনই দেখা যায়। সামাজিক খারাবি আমাদেরকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিয়ে যাচ্ছে।

অন্যদিকে সমাজ সংশোধনের দিকে তাকালে স্থূল দৃষ্টিতে মনে হয়, তাতে কোনো কমতি হচ্ছে না। কত ধরনের সংগঠন, দল ও পার্টি এসলাহ ও সংশোধনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার হিসাব নেই। প্রত্যেক সংগঠন নিজেদের সামর্থ্য অনুসারে কিছু না কিছু করেই যাচ্ছে। দেশের কোনো উল্লেখযোগ্য স্থান তাদের কর্মপরিধির বাইরে নয়। তাদের চেষ্টায় সীমিত ফলও কোনো কোনো জায়গায় প্রতিভাত হয়। তবে সামষ্টিকভাবে পুরো সমাজের অবস্থা বিবেচনা করলে তাদের কর্ম-প্রচেষ্টা নিতান্ত কম মনে হয়। সমাজের সামষ্টিক পরিবেশে তাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা প্রভাব বিস্তার করছে না; ভবিষ্যতে করার আশাও ক্ষীণ।

বর্তমান পরিস্থিতির পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। কালের আবর্তে কারণগুলো এতই প্রকট হয়েছে যে প্রতিকার করা সহজ নয়। তবে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ নিয়ে আলোচনা করব। অনেক সময় যার দিকে আমরা ভ্রুক্ষেপই করি না। আর তা হলো, আমাদের সামাজিক মেজাজ এ রকম হয়ে গেছে যে অন্যের দোষ তালাশ ও ভুল-ত্রুটি পর্যালোচনা করার মাঝে যে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ হয়, তা ভিন্ন কোনো এসলাহী কাজে হয় না। অবস্থা-খারাবির সমালোচনাকে আমরা সময় কাটানোর মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছি। সমালোচনার নিত্যনতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করছি। কিন্তু খারাবি ও সমস্যার এসলাহের জন্য যথাযথ কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করছি না। অবস্থার পরিবর্তন ও সংশোধনের জন্য কোনো পদক্ষেপ যদি গ্রহণ করি, তখন আমাদের চাহিদা ও চেষ্টা থাকে, অন্যকে এসলাহ করার মাধ্যমে যেন আমাদের সংশোধনকর্ম সূচনা হয়। আমাদের এসলাহী কর্মের চেষ্টা-প্রচেষ্টা এই নীতির ওপর ভিত্তি করে অগ্রসর হয় যে, আমরা ছাড়া পুরো পৃথিবীর সবাই খারাপ। তাদের সকলের আমল-আখলাক সংশোধন করার দায়িত্ব আমাদের ওপর আরোপিত হয়েছে। এই নীতির বাইরে গিয়ে খুব অল্প মানুষই এই ধারণা রাখে যে, কিছু খারাবি আমার নিজের মধ্যেই রয়েছে। সর্বপ্রথম তা সংশোধন করার প্রতিই আমার মনোযোগ দেওয়া দরকার। নিজের অবস্থা বেমালুম ভুলে গিয়ে কেবল অন্যদেরকে নিশানা বানিয়ে যে এসলাহী কর্ম শুরু করা হয়, তাতে তেমন কোনো ফায়দা হয় না। বরং তা একটি রেওয়াজ-রসম হয়ে থেকে যায়।

সমাজের হালচাল ও মানুষের আমল নিয়ে আপত্তি ও সমালোচনার মারাত্মক ও ক্ষতিকর দিক হলো, কোনো কোনো সময় সামাজে প্রচলিত খারাপ কাজগুলো নিজের জন্য জায়েয আখ্যা দেওয়া হয়। তাই তো এ কথা অনেকের মুখে শোনা যায়, 'কাজটি সঠিক নয়; তবে বর্তমান অবস্থা দেখে করতে হচ্ছে!' ফলাফল এই হয় যে, আমরা বর্তমান সময় এবং চলমান খারাপ কাজ নিয়ে এভাবে সমালোচনা করি, যেন আমরা তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। কিন্তু সমালোচনার পরে বাস্তবিক জীবনে খারাপ কাজগুলোতে নির্দ্বিধায় লিপ্ত হই। অথচ উক্ত কাজের সমালোচনায় আমরা পুরো শক্তি ব্যয় করেছি।

আমাদের চোখের সামনে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। আমরা নিশ্চিত জানি, আগুন নিয়ন্ত্রণে না আনলে পুরো এলাকা জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেবে। তখনও কি আমাদের উদ্যোগ এই হবে যে, আমরা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রুমে বসে সমালোচনা ও হা-পিত্যেশ করব? হাত-পা নেড়ে একটু চেষ্টা করব না? এমন পরিস্থিতিতে বেকুব ও নির্বোধ ব্যক্তিও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাকে

সাজিয়ে-গুছিয়ে সমালোচনা করার আগে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ফায়ার সার্ভিসে ফোন দেবে। সাধ্যমতো নিজেও আগুন নেভানোর চেষ্টা করবে। তার পরও যদি আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব না হয়, অন্তত সে আগুনকবলিত এলাকা থেকে পালানোর চেষ্টা করবে। তবে চূড়ান্ত পাগলই এই কাজ করতে পারে যে, আগুন নেভানোর তদবির না করে বসে বসে আগুনের সমালোচনা করবে এবং আগুনে ঘি ঢালবে!

কিন্তু সামাজিক অধঃপতনের যে আগুনের আলোচনা আমরা দিন-রাত করে থাকি, আশ্চর্যের বিষয় হলো, আমরা সমালোচনা তো করি; পরে নিজেই উক্ত খারাপ কাজে লিপ্ত হই। আমরা ঘুষখোরকে খুবই নিন্দাবাদ জানাই; তবে অনেক সময় খোদ আমরাই ঘুষ আদান-প্রদান করি। মিথ্যা, খেয়ানত ও হারাম ভক্ষণের শাস্তি ও ভয়াবহতা সম্পর্কে আমরা গলা উঁচিয়ে বলি; তবে দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে আমরা তা থেকে আর বিরত থাকি না। আমাদেরকে আপত্তি করা হলে সহজ জবাব দিই, পুরো সমাজ একই স্রোতে যাচ্ছে; আমি ভিন্নভাবে চলি কিভাবে? আমাদের জবাবের উদাহরণ এ রকম হয়ে গেল না, কোনো ব্যক্তি দাউদাউ জ্বলন্ত আগুন দেখে তাতে ঘি ঢেলে দিল?!

যে সমাজে গোনাহ ও গোমরাহি ব্যাপক হয়েছে, তাতে বসবাসের ক্ষেত্রে কোরআনুল কারীমে একটি মূলনীতি বিবৃত হয়েছে। তার ওপর আমল না করার কারণে আমাদের এই দুরবস্থা। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের চিন্তা করো। তোমরা যেহেতু সৎপথে রয়েছ, কেউ পথভ্রান্ত হলে তাতে তোমাদের কোনো ক্ষতি নেই। তোমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে বলে দেবেন, যা কিছু তোমরা করতে। (মায়েদা : ১০৫)

উক্ত আয়াত এই নিরেট বাস্তবতার বর্ণনা দিচ্ছে যে, অন্যের মন্দকাজ তোমাদের মন্দকাজ বৈধ হওয়ার দলিল হতে পারে না। তাদের সমালোচনা করেও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন হবে না। তোমাদের কাজ হলো সবার আগে নিজের এসলাহের ফিকির করো। অন্তত নিজে মন্দকাজগুলো থেকে বিরত থেকো। সর্বশক্তি ব্যয় করে নিজের এসলাহের চেষ্টা করো। যেসব গোনাহ ত্বরিত ছেড়ে দেওয়া সম্ভব, তা থেকে এখনই পবিত্র হয়ে যাও। আর যেসব গোনাহ পরিহার করার জন্য চেষ্টা-মুজাহাদা দরকার, তার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাও। অন্য কেউ ঘুষ নিচ্ছে; অন্তত তুমি ঘুষ থেকে বিরত থেকো। সে খেয়ানত ও বিশ্বাসভঙ্গ করেছে; অন্তত তুমি খেয়ানত থেকে বেঁচে চলো। অন্যরা মিথ্যা বলছে; অন্তত তুমি সত্যকে নিজের নিদর্শন বানিয়ে নাও। অন্য কেউ হারাম ভক্ষণ করছে; অন্তত তুমি হারাম লোকমা মুখে না দেওয়ার অঙ্গীকার করো। উপরোক্ত নসীহা দিয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا وَهَوًى مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعِ الْعَوَامَّ

যখন দেখবে কৃপণতার বশ্যতা করা হচ্ছে, নাফসের অনুসরণ করা হচ্ছে, দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে এবং প্রত্যেকে নিজের মতকে সর্বোত্তম মনে করছে, তখন তুমি শুধুমাত্র নিজেকে রক্ষায় নিয়োজিত থেকো এবং সাধারণের ভাবনা ছেড়ে দিও। (তিরমিযী, হাদীস : ৩০৫৮; আবু দাউদ : ৪৩৪১; ইবনে মাজাহ : ৪০১৪)

হাদীসের ব্যাখ্যা হলো, উক্ত পরিস্থিতিতে ব্যাপকভাবে গোনাহের সয়লাব হওয়ার কোনো সমাধান নেই। তা থেকে উত্তরণের পথ হলো, প্রত্যেকে নিজের সংশোধনের ফিকির করবে। নিজেকে প্রচলিত সব গোনাহ থেকে বাঁচানোর জন্য যারপরনাই চেষ্টা করবে। আরেক হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ .

যদি কোনো ব্যক্তি বলে 'মানুষ বরবাদ হয়ে গেছে' তাহলে সে সব লোকের চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। (সহীহ মুসলিম, হাদীস : ৬৫৭৭)

তার মানে, যে ব্যক্তি সর্বদা অন্যের সমালোচনা নিয়ে ব্যস্ত, নিজের দোষ সম্পর্কে বেখবর, সেই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত। তা না করে সে যদি নিজের এসলাহের ফিকির করত, পাপ ও দোষ-ত্রুটি দূর করে নিজের আমল-আখলাক শোধরানোর চেষ্টা করত, তাহলে অন্তত সমাজের একজন ব্যক্তির বরবাদি ও খারাবি কমে যেত। অভিজ্ঞতার কথা হলো, 'সমাজে প্রদীপ থেকে প্রদীপ জ্বলে।' একজনের সংশোধন অন্যের সংশোধনের মাধ্যম হয়। ব্যক্তি-সমষ্টির নামই তো সমাজ। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি নিজের সংশোধনের ফিকির করে, আস্তে-ধীরে পুরো সমাজ পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে।

সমাজ, পরিবেশ ও মন্দকাজের সমালোচনা করা চলমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের কার্যকরী পন্থা নয়। তার মাধ্যমে আশাব্যঞ্জক কোনো ফলাফল তো আসবে না, বরং অনেক সময় সবার মাঝে হতাশা ছড়িয়ে পড়ে। মন্দকাজে

লিপ্ত হওয়াকে সহজ মনে করা হয়। কোরআন-সুন্নাহর আলোকে উক্ত পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পথ হলো, আমরা প্রত্যেকে নিজেকে নিয়ে ফিকির করব। নিজেকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করব, তোমার ওপর আল্লাহ ও বান্দার কী কী হক ও ফরজ রয়েছে? সেই হক ও ফরজ কতটুকু পালন করছো? সমাজে প্রচলিত যেসব গোনাহ নিয়ে সমালোচনা করি, নিজেও কি তাতে লিপ্ত হই?

এই দৃষ্টিকোণ থেকে যেহেতু আমরা নিজেদের যাচাই করিনি, তাই অনেকে সস্তা বাহাস পেশ করে, 'শত শত মন্দকাজের ভিড়ে একা আমার দ্বারা কী হবে?' ইনসাফের সাথে যদি আমরা নিজেকে যাচাই করি, তাহলে শত শত মন্দের ভিড়ে একলা আমি অনেক কিছুই করতে পারব। যাচাই করলে দেখতে পাব, আমার অনেক ভুল-ত্রুটি এ রকম যা আমি এখনই সংশোধন করতে সক্ষম। তা সংশোধনের পথে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। অনেক ভুল-ভ্রান্তি এ রকম আছে, যা হয়তো ত্বরিত সংশোধন করা যাবে না বটে; কিন্তু এখনই তার পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। কিছু গোনাহ এ রকম আছে, যার ক্ষতিপূরণ ও প্রতিকার একটু জটিল। তবে সেই জটিলতা এ রকম নয় যে, যার সমাধান করা অসম্ভব। তাই এখনই জটিলতা সমাধান করার ফিকির করা যায়। আমাদের সমাজে এ রকম মানুষও একেবারে কম নয় যে, যারা জ্বলন্ত আগুনতুল্য গোনাহের পরিবেশে থেকেও নিজেকে সমূহ গোনাহ থেকে গুটিয়ে রেখে চলেন। গোনাহ মুক্ত থাকার কারণে তারা মরে যাননি। অন্যদের মতো তারাও তো জীবিত আছেন। বাস্তবতার আলোকে বলতে হয়, তারা অন্যদের চেয়ে বেশি ভালো আছেন।

তবে আমাদের এসব কথার প্রভাব তখনই প্রতিফলিত হবে, যখন অন্তরে এসলাহীর ফিকির থাকবে এবং সেই ফিকির থেকে নিজের আমল-আখলাক যাচাই করার অভ্যাস গড়ে উঠবে। যেদিন সেই অভ্যন্তরীণ শক্তি জাগ্রত হবে এবং অন্তর তা কবুল করার জন্য প্রস্তুত হবে, সেদিন এই বাস্তবতা উন্মোচিত হবে যে, 'সমাজ অনেক খারাপ' বলে বলে মাথার ওপর আমরা যে বোঝা চেপে নিয়েছি এবং যার অজুহাত দিয়ে নিজের সংশোধনের সকল দরজা রুদ্ধ করে রেখেছি, তা কতই না অবাস্তব ও অবান্তর। অসুস্থ ব্যক্তির জন্য জরুরি হলো সে নিজের অসুস্থতা উপলব্ধি করবে। সাথে সাথে অন্তরে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল রাখবে যে, সব রোগের নিরাময় রয়েছে। বর্তমানে আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, আমরা সেই 'উপলব্ধি' এবং 'বিশ্বাস' ছাড়াই রোগের চিকিৎসা করার চেষ্টা করি।

পবিত্র কোরআন অনুবাদের মূলনীতি

মুফতী শরীফুল আজম

হেরা থেকে উৎসারিত বিশ্বব্যাপী আলোকোজ্জ্বল এক দীপ্তিময় আলোকবর্তিকা হলো আল কোরআন, যা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশীগ্রন্থ। বিশ্বমানবতার চিরন্তন মুক্তির সনদ এবং অনন্য বিধানগ্রন্থ আল কোরআন। যার অধ্যয়ন ও বাস্তবায়নের মধ্যে রয়েছে মানবজাতির কল্যাণ ও সফলতা। ইসলামী মূলনীতির প্রথম ও প্রধান উৎস হলো আল কোরআন। যার সফল ও স্বার্থক বাস্তবায়ন ঘটেছে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব নবী করীম (সা.)-এর মাধ্যমে। নবুয়তের ২৩ বছর জীবনব্যাপী যুগোপযোগী প্রেক্ষাপটের ক্রমধারায় তাঁর ওপর অবতীর্ণ হয় এই মহান ঐশীগ্রন্থ। তিনি ছিলেন আল কোরআনের বাস্তব নমুনা।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য কী, তা ব্যক্ত করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (سورة آل عمران- ١٦٤)

"আল্লাহ মুমিনদের ওপর বড়ই দয়া ও অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের থেকেই একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল।" (আলে-ইমরান : ১৬৪)

এখানে আল্লাহ তা'আলা নবী প্রেরণের চারটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন,

১. يتلو عليهم آياته তাদেরকে কিতাব ও আয়াতসমূহ পড়ে শোনান।

২. ويزكيهم তাদেরকে পবিত্র করেন। অর্থাৎ তাদের চরিত্রকে পূত-পবিত্র ও সুন্দর করেন, উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বানান।

৩. ويعلمهم الكتاب তাদেরকে কিতাবের তা'লীম দেন।

৪. والحكمة হিকমতের তা'লীম দেন।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক কোরআন শরীফের আয়াতের তেলাওয়াতকে নবী প্রেরণের পৃথক একটি উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আর কোরআন বোঝাকে আলাদা আরেকটি উদ্দেশ্য হিসেবে। এ দ্বারা অনেকের ভুল-বোঝাবুঝির অবসান হবে বলে আশা করি। যাঁরা বলেন, মাদরাসায় বাচ্চাদেরকে তোতা পাখির মতো কোরআন মুখস্থ করানো হয়। অর্থ ও ব্যাখ্যা না বুঝলে তাদের কী ফায়দা হবে? কোরআনের এ আয়াত ওই সব লোকের ভুল-বোঝাবুঝির অবসান করে ঘোষণা দিচ্ছে যে, কোরআনের তেলাওয়াত স্বয়ংসম্পূর্ণ পৃথক একটি উদ্দেশ্য। কোরআন শরীফ হচ্ছে, হেদায়াতের এমন ব্যবস্থাপত্র, যার একেকটি অক্ষর পাঠ করলে দশ দশটি নেকি পাওয়া যায়। এটি সাধারণ ডাক্তার বা হেকিমদের ব্যবস্থাপত্রের মতো নয়। কারণ তাদের ব্যবস্থাপত্র বুঝতে না পারলে কোনো উপকারে আসে না। কাজেই তেলাওয়াত হচ্ছে কোরআন বোঝার প্রথম ধাপ।

কোরআন করীম এমন একটি কিতাব, যা নিয়ে আসতেন হযরত জিবরাঈল (আ.)। তিনি কোরআন পড়ে শোনাতেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

'যখন ফেরেশতা কোরআন পড়তে আরম্ভ করবেন তখন আপনি তার অনুসরণ করুন।' (সূরা আল কিয়ামাহ ১৯) নবী করীম (সা.) সাহাবীদেরকে কোরআন শরীফ এভাবেই পড়ে শোনাতেন, যেভাবে কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। আর সাহাবায়ে কেরাম তা শিখতেন। কোরআনের অর্থ বোঝার জন্য কোরআনের আয়াতসমূহ সঠিকভাবে উচ্চারণ করা ও পড়া প্রথম শর্ত। কেউ সহীহ-শুদ্ধভাবে কোরআন তেলাওয়াত করতে না পারলে সে কী করে কোরআন বুঝবে? তা ছাড়া কোরআনের তেলাওয়াত হচ্ছে পৃথক একটি উদ্দেশ্য। তাই কেউ এ কথা মনে করবেন না, মক্তবে কোরআন পাঠ শেখা ও শেখানো বেকার। নাউযুবিল্লাহ।

আরবী ভাষায় কোরআন শেখা

পবিত্র কোরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব। আরবী ভাষা কোরআনের ভাষা, রাসূল (সা.)-এর ভাষা, জান্নাতের ভাষা। এ ভাষা শেখা প্রতিটি মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। কারণ মানুষ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা আরবী ভাষা ছাড়া হৃদয়াঙ্গম করতে পারবে না, যদিও তার অনুবাদ করে পেশ করা হয়। কেননা তরজমা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। এমনকি উলামায়ে কেরামের মাঝে অনেকের মতে কোরআনের প্রকৃত অনুবাদ অসম্ভব। কারণ যা কিছু অনুবাদ করে পেশ করা হবে, তা কোনো না কোনো মানুষের চয়িত কথা। আর শব্দ চয়নে অনেক সময় অনুবাদকের ভুলও হয়ে থাকে। কাজেই তরজমা পাঠকারী তখন সঠিক বিষয়টি অনুধাবন করতে সক্ষম হন না।

আজকাল অনেকে কোরআনের অনুবাদের প্রতি বিভিন্নভাবে মানুষকে উৎসাহিত

করে থাকে। ফলে মানুষ কোরআনের মূল ভাষা বোঝার চেষ্টা করে না বরং মূল কোরআন থেকে নিজেদের অনেকটা অমুখাপেক্ষী মনে করে। তারা হয়তো ভাবতে পারে আরবীতে কোরআন শেখা তেমন কোনো গুরুত্ব রাখে না। ইসলামের ভাষাগত কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। এমনকি অনেকে আরেকটু অগ্রসর হয়ে আরবীর প্রতি এক ধরনের অনীহা প্রকাশ করে থাকে। তারা মুসলমানদের কে নিজ নিজ ভাষায় আজান, নামাজ এবং খুতবা প্রদানে উৎসাহ জুগিয়ে থাকে। অথচ সকল মাযহাবের আলেমগণ ইসলামের এ সকল গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতসমূহ ইসলামের ভাষায় তথা আরবী ভাষায় আদায় করার প্রতি ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

ইসলাম থেকে এ ধরনের বিমুখিতা এবং দ্বীনি ইলমের দৈন্যতার ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আরবী জানার মতো বিজ্ঞ আলেমের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। যোগ্য আলেম না থাকার ফলে খ্রিস্টানদের পক্ষ থেকে ইসলামের ওপরে যে সকল আপত্তি পেশ করা হয়ে থাকে, কোরআনের ওপর যে সকল প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় তার সঠিক সমাধান দেওয়ার মতো লোক খুঁজে পাওয়া যায় না।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে আমাদেরকে কোরআন বোঝা, কোরআনের ওপর আমল করা, কোরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং কোরআনকে নিজের জীবনের আদর্শ হিসেবে ধারণ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। কাজেই আমরা কোরআন থেকে কী পাচ্ছি? কোরআন পড়ে কী বুঝতে পারলাম? নামাজে কোরআন তেলাওয়াত করে সেখানে আমরা আল্লাহর কাছে কী চাচ্ছি? তা অনুধাবন করতে হলে আরবী ভাষা শিখতে হবে। বলতে গেলে আরবী শেখা অন্যতম একটি দ্বীনি জরুরত।

তা ছাড়া এ কথা আমরা দৃঢ়ভাবে বলতে পারি যে মুসলমানদের এই অধঃপতন এবং ইসলামী শাসনব্যবস্থা দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পেছনে মূল কারণ হচ্ছে মুসলমানদের কোরআন বিমুখিতা। মুসলমানদের হারানো গৌরব ফিরে পাওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে, কোরআনের দিকে ফিরে আসা। কোরআনকে মজবুতভাবে ধারণ করা।

শুধু আরবী ভাষা জানাই যথেষ্ট নয়

আরবীভাষীদের কিতাবুল্লাহর শিক্ষাদানের জন্য নবী প্রেরণ করা হয়েছে। রাসূল (সা.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্যাবলির মধ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি হচ্ছে কিতাবুল্লাহ শিক্ষাদান। এ উদ্দেশ্যের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ويعلمهم الكتاب 'রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুমিনদেরকে কিতাবের তা'লীম বা শিক্ষা দেন।। কিতাবের তা'লীম দ্বারা কী উদ্দেশ্য? শুধু আয়াতের অনুবাদ বলে দেবেন? তিনি তো শিক্ষা দেবেন আবু বকর, উমর, উসমান, আলী (রা.)-এর মতো ব্যক্তিদের। তাঁরা কি আরবী ভাষা জানেন না? তাঁদের প্রত্যেকেই তো আরবী ভাষায় দক্ষ ছিলেন। অন্যদিকে কোরআনের ঘোষণা بلسان عربى مبين 'কোরআন স্পষ্ট আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করা হয়েছে।' তাহলে তো আরবী ভাষা শিক্ষা করার জন্য বা কোরআনের অর্থ বোঝার জন্য তাঁদের কোনো শিক্ষকের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু দেখা যায়, এর পরও আল্লাহ তা'আলা আরবীভাষীদের কোরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য নবী প্রেরণ করেছেন। এ থেকে বোঝা গেল, কেবল অনুবাদ পড়ে নিলে অথবা শুধু আরবী ভাষা জেনে নিলে কিতাবুল্লাহর বুঝ ও কোরআনের ইলম অর্জন হয় না; বরং কোরআনকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে কোনো শিক্ষক বা মুরব্বির অবশ্যই প্রয়োজন। তাই তো নবী ছাড়া শুধু কিতাব কখনো অবতীর্ণ হয়নি। আল্লাহ তা'আলা যে কিতাবই অবতীর্ণ করেছেন, ইঞ্জিল, যাবুর, তাওরাত বা কোরআন প্রত্যেকটির সাথে নবী পাঠিয়েছেন। এমনও ঘটেছে যে নবী এসেছেন, নতুন কিতাব আসেনি। তবে এমন উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে না যে, শুধু কিতাব এসেছে, নবী আসেননি। কেন? কারণ মানুষকে তো আল্লাহ পাকই সৃষ্টি করেছেন, তাই মানুষের প্রকৃতি ও স্বভাব তাঁরই ভালো জানা আছে যে কিতাবের সাথে মানুষের জন্য শিক্ষক ও অভিভাবকেরও প্রয়োজন।

'কোরআন সহজ'–এ কথার অর্থ কী?

কোরআন শরীফের একটি আয়াতের অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে কারো কারো ভুল হয়। এখানে তা দূর করা জরুরি। কোরআন বলে, ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر 'আমি কোরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব কেউ আছে কি যে উপদেশ গ্রহণ করবে।

কেউ কেউ বলে, আমরা কোরআন থেকেই কোরআনের অনুবাদ নিজে বুঝব এবং এর ওপর আমল করব। যারা এমন কথা বলে, তারা এ আয়াতের মর্মই বোঝেনি। খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে যে কোরআনের বিষয়বস্তুসমূহ দুই প্রকার।

প্রথম প্রকার : কিছু আয়াত এমন রয়েছে, যেগুলোতে আল্লাহপাক মানুষকে উপদেশ দিয়েছেন যে আল্লাহ এক, আখেরাত সম্পর্কে বলেছেন যে একদিন তোমাদের সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। এ উপদেশ একজন সাধারণ মানুষ শুধু অনুবাদ পড়ে গ্রহণ করতে পারবে। এ কারণেই তো কোরআন স্পষ্ট বলেছে, উপদেশ গ্রহণের ক্ষেত্রে সহজ।

দ্বিতীয় প্রকার : দ্বিতীয় প্রকারের বিষয়বস্তু, যেগুলোতে আল্লাহ পাক আহকাম ও আমছাল বা উপমা পেশ করেছেন। এসব হুকুমের ব্যাপারে আল্লাহ নিজে বলেন,

تلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون

'আমি এসব উপমা মানুষের উপকারার্থে প্রদান করে থাকি, তবে তা কেবল ইলমওয়ালারাই বুঝবে'। আর ইলম তা-ই, যা সাহাবায়ে কেরাম অর্জন করেছিলেন। যদি চৌদ্দশ বছর পর এখন কেউ বলে, আমি নিজে গবেষণা করে কোরআনের ব্যাখ্যা বলব, এ পর্যন্ত যা তাফসীর করা হয়েছে তা আমার বুঝে আসছে না, এগুলো আমি মানি না, বরং আমি আমার বুদ্ধি দিয়েই বুঝব, তাহলে ওই ব্যক্তি পদে পদে ভুল করবে।

কোরআন বোঝার গুরুত্ব :

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

"আমি একে আরবী ভাষায় কোরআন রূপে অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পারো।" অতএব যেহেতু কোরআন মাজিদকে বোঝার জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাহলে তা শেখাও জরুরি।

অপর আয়াতে বলা হয়েছে,

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

"তারা কি কোরআন নিয়ে চিন্তা করে না, নাকি তাদের অন্তরে তালা লেগে আছে।" অতএব কোরআনকে যদি গভীরভাবে বুঝতে হয় তাহলে তা শেখা ছাড়া কখনোই সম্ভব হবে না।

অপর আয়াতে বলা হয়েছে,

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (سورة ص : ٢٩)

"এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি বরকত হিসেবে অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ লক্ষ করে এবং বুদ্ধিমানগণ যেন তা অনুধাবন করে।"

তাফসীরে ফাতহুল বয়ানে বলা হয়েছে, এ আয়াত এ কথার প্রমাণ বহন করে যে আল্লাহ তা'আলা কোরআনকে অবতীর্ণ করেছেন তার অর্থের মাঝে চিন্তা-ফিকির করার জন্য। চিন্তা না করে শুধুমাত্র তিলাওয়াত করার জন্য অবতীর্ণ করেননি।

হাদীস শরীফেও আমরা লক্ষ করলে দেখতে পাই কোরআন বোঝা এবং অনুধাবন করার প্রতি, শেখা এবং শেখানোর প্রতি খুবই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এক হাদীসে আছে,

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ،

"তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি, যে কোরআন শিখে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।" এই হাদীসে নবীজি সাল্লাল্লাহু সাল্লাম সর্বোত্তম ব্যক্তি বলে আখ্যা দিয়েছেন ওই সকল লোককে, যারা কোরআন শিখে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।

অপর হাদীসে এসেছে,

عن عبيدة المليكى، وكانت له صحبة قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " :يا أهل القرآن، لا توسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهار وأفشوه، وتغنوه وتدبروا ما فيه لعلكم تفلحون، ولا تعجلوا تلاوته فإن له ثوابا "(شعب الايمان للبيهقى١٨٥٢)

নবীজি সাল্লাল্লাহু সাল্লাম ইরশাদ করেন, হে কোরআনওয়ালারা! তোমরা কোরআনকে টেক লাগিয়ে বসে থেকো না বরং রাত-দিন যথাযথভাবে এর তিলাওয়াত করো, প্রচার করো, সুর করে পড়ো এবং এর অর্থের মাঝে চিন্তা-ভাবনা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও। এর প্রতিদান দ্রুত পাওয়ার আশা কোরো না। কেননা এর জন্য অনেক বিশাল সাওয়াব রয়েছে। (বায়হাকী ১৮৫২)

উক্ত হাদীসে নবীজি (সা.) কোরআনকে গভীরভাবে চিন্তা করে বোঝার আদেশ করেছেন আর শেখা ছাড়া গভীরভাবে বোঝা কখনোই সম্ভব নয়।

আঞ্চলিক ভাষায় তরজমা করা :

আরবী ভাষা যাদের জানা নেই তাদেরকে নিজের মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষায় কোরআন চর্চা করতে হবে। কোআন থেকে দূরে থাকা যাবে না, বঞ্চিত হওয়া চলবে না। কেননা ইসলাম ধর্মের যাবতীয় শিক্ষার মাঝে পবিত্র কোরঅনের শিক্ষা একটি মৌলিক বিষয়। আল্লাহর কালামকে সঠিক অর্থে বোঝা ধর্মীয় শিক্ষার ভিত্তি। সুতরাং প্রত্যেক যুগের বিজ্ঞ আলেমগণ যুগ চাহিদাকে বিবেচনায় রেখে সাধারণ মানুষের কাছে কোরআনের শিক্ষা স্থানান্তরের জন্য দুর্দান্ত প্রচেষ্টা করেছেন। প্রত্যেকেই নিজ সমকালীন পরিবেশ ও প্রয়োজনীয়তা বুঝে সে হিসেবে যুগীয় ভাষা-পরিভাষায় কোরআনের শিক্ষাকে সমাজের লোকদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, ফলে তাদের সমস্যাগুলো কোরআনের আলোকে সমাধান করা সহজ হয়েছে এবং সাধারণ মানুষ সামগ্রিক কল্যাণ এবং সাফল্য লাভে ধন্য হয়েছে। এতে কেবল সময়ের চাহিদাই পূরণ হয়নি বরং মানুষের সকল সমস্যা সমাধানের পথ উন্মোচিত হয়েছে।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.)-এর সংস্কার :

এটি সত্য যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মহান চিন্তাবিদ এবং সংস্কারক হযরত ইমাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.) এমন এক ব্যক্তিত্ব, যিনি তাঁর সময়ের প্রয়োজনীয়তা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি সমস্ত ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে এমন সব সংস্কার এনেছেন, যা মানবতার সমস্যার সমাধানের জন্য অপরিহার্য ছিল। যদিও তিনি ইলমে দ্বীনের সকল শাখায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চিন্তা-চেতনা জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন। তবে বিশেষত, পবিত্র কোরআন শিক্ষার ব্যাপক প্রসার, তা বোঝার মূলনীতি ও বিধি প্রণয়ন এবং তাফসীরের মূলনীতি সংকলনের ক্ষেত্রে

তিনি অদ্বিতীয়। নিঃসন্দেহে তিনি কোরআন শিক্ষার প্রচার-প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তিনি পুরো কোরআন আল-হাকিমকে ফার্সিতে অনুবাদ করেছিলেন। এর নাম দিয়েছিলেন 'ফাতহুর রহমান'। এমন এক সময়ে এই অনুবাদটি করা হয়েছিল, যখন বিশ্বজুড়ে পণ্ডিতরা কোরআনকে অন্য ভাষায় অনুবাদ করা বৈধ কি না, তা নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

বিগত তিন শতাব্দীতে কোরআন বোঝার যে আন্দোলন এবং পদ্ধতি ও রীতিনীতি দেখা গেছে তাতে হযরত ইমাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীর উদ্ভাবিত রীতি-নীতির ছাপ স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। উলূমে কোরআন অধ্যয়নের ক্ষেত্রে সকল ঘরানার লোক হযরত শাহ সাহেবের কাছে ঋণী।

সকলের জন্য কোরআন তরজমা :

আঞ্চলিক ভাষায় সকল শ্রেণী-পেশার মুসলমানদের জন্য কোরআন তরজমা পড়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কতটুকু? এ ব্যাপারে আকাবিরে দেওবন্দের মতামত তুলে ধরা হলো।

এক.

শায়খুল ইসলাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) কৃত 'ফাতহুর রহমান ফি তরজমাতিল কোরআন'-এর ভূমিকায় তিনি লেখেন, বিশুদ্ধ কোরআন তিলাওয়াত শেখার পর এবং ফার্সি ভাষার প্রাথমিক কিতাব অধ্যয়নের পড়ে অথবা ফার্সি ভাষা ভালোভাবে বোঝার পরে এই কিতাবটি পড়ানো উচিত। বিশেষ করে বিভিন্ন পেশাজীবী, যাদের জন্য আরবী পড়াশোনা করা বা উচ্চমানের দ্বীনি এলেম শেখার সুযোগ নেই, তাদের জন্য উপকারী। শিশুদের বোধশক্তি উদয় হওয়ার পরেই এ কিতাবটি তাদেরকে শেখানো উচিত। যাতে করে তাদের কচি মনে সর্বপ্রথম কোরআনের অর্থ গেঁথে দেওয়া সম্ভব হয় এবং তাদের মাঝে ইসলামকে পালন করার স্বভাবজাত যে প্রতিভা রয়েছে, তা বিনষ্ট না হয়। আর সমাজে নাস্তিক-মুরতাদ আর খোদাদ্রোহীদের যে অপপ্রচার রয়েছে তার দ্বারা প্রভাবিত না হয়। অবান্তব, অহেতুক, অপ্রয়োজনীয় শিক্ষা তাদের কচি মনের পর্দায় দাগ কাটতে না পারে। বিশেষ করে ওই সকল মুসলমান, যাদের জীবনের একটা বড় অংশ ভুল পথে কাটানোর পরে তাওবার তৌফিক হয়েছে, কিন্তু উচ্চতর দ্বীনি এলেম শিক্ষা তাদের জন্য সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাদের জন্য এই কিতাবটি খুব দরকার, যাতে তিলাওয়াতের মিষ্টতা অনুভব করতে পারে। মুসলিম জনসাধারণের জন্য এই কিতাবটি অনেক উপকারী হবে, ইনশাআল্লাহ।

এখানে আমরা দেখতে পেলাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.), বিশেষ করে বিভিন্ন পেশাজীবী মুসলিম নর-নারীর জন্য নাহু সরফ শেখা ছাড়াই কোরআন শরীফের অর্থ শেখার প্রতি পরিষ্কার নির্দেশনা দিয়েছেন, যা ব্যাখ্যা করে বোঝানোর অপেক্ষা রাখে না।

দুই.

শাহ আব্দুল কাদের দেহলভী (রহ.) তাঁর কিতাব 'মুয়ায্যিহুল কোরআন'-এর ভূমিকায় লেখেন, মুসলমানদের জন্য আবশ্যক নিজের পালনকর্তাকে চেনা, তাঁর গুণাবলি জানা, তাঁর হুকুম-আহকাম অবগত হওয়া, তাঁর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি যাচাই করা। কেননা এ ছাড়া বন্দিগী পরিপূর্ণ হতে পারে না। আর যে বন্দেগী করে না সে বান্দা হতে পারে না। আল্লাহর পরিচয় লাভ হবে কেউ বলে দিলে। মানুষ জ্ঞানশূন্য অবস্থায় দুনিয়াতে ভূমিষ্ঠ হয়। অতঃপর শেখানোর মাধ্যমে সব জিনিস শেখে। তবে আল্লাহর পরিচয় কোনো ব্যাখ্যাদাতা যত ব্যাখ্যা করেই বোঝাক না কেন তা কখনো স্বয়ং আল্লাহ পাক যেভাবে বলেছেন তার সমতুল্য হতে পারে না। আল্লাহর কালামের মাঝে যে হেদায়েত ও নির্দেশনা রয়েছে তা অন্যের কথার মাঝে হতে পারে না। আর কালামে পাক আরবী ভাষায় হওয়াতে ভারতবাসীরা তা বুঝতে সক্ষম নয় বিধায় এই অধম বান্দা আব্দুল কাদেরের মনে এ কথা জেগে উঠেছে যে, বর্তমান যুগে হিন্দি ভাষায় কোরআন শরীফের তরজমা করা প্রয়োজন। এখানে কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ রাখতে হবে।

১. তরজমা হুবহু শব্দে শব্দে মিল রেখে করা জরুরি নয়। কেননা হিন্দি ভাষার বাক্যের গঠন আরবী ভাষার তরকীব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যদি হুবহু আরবীকে হিন্দিতে অনুবাদ করা হয় তাহলে অর্থ বুঝে আসবে না।

২. এখানে দুর্বোধ্য কোনো ভাষা ব্যবহার করা হয়নি বরং সাধারণের মাঝে প্রচলিত ভাষা সাবলীল সাদামাটা হিন্দি ভাষায় তরজমা করা হয়েছে।

৩. সর্বোপরি এর দ্বারা কোরআনের অর্থ বোঝা সহজ হবে। কিন্তু এখানে উস্তাদের কাছ থেকে সনদ লাভ করা আবশ্যক। উস্তাদ ছাড়া কোরআন তরজমা বোঝা গ্রহণযোগ্য নয়। তা ছাড়া কথার পূর্বপর সম্পর্ক যাকে 'রব্তে কালাম' বলা হয় তা উস্তাদ ছাড়া জানা সম্ভব নয়। কাজেই দেখা যায় কোরআন আরবী ভাষা হওয়া সত্ত্বেও আরবের লোকেরা আরবী ভাষাভাষীরা উস্তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে।

তিন.

মাওলানা নবাব সিদ্দিক হাসান খান সাহেব (রহ.) কৃত 'তরজমাতুল কোরআন'-এর ভূমিকায় তিনি লেখেন, সকল উম্মতের ওপর আবশ্যক যে, যেভাবে তারা সর্বপ্রথম বাচ্চাদেরকে কোরআনের শব্দ পড়িয়ে তাকে তিলাওয়াত শিখিয়ে থাকে, ঠিক এ বিষয়টিও তারা গুরুত্ব দেওয়া চাই যে তারা নিজ ভাষা শেখার সাথে সাথে প্রথমে 'মুয়াযযিহুল কোরআন'-এর সবক দেবে, যাতে সে কোরআনের শাব্দিক অর্থ

বুঝতে সক্ষম হয়।

তিনি আরো বলেন, কোরআনের অবতরণ শুধুমাত্র তিলাওয়াতের জন্য নয় বরং এই জন্য যে, সেটা পড়ে তার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝবে। আর এটা শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, প্রতিটি মুসলমানের জন্য আবশ্যক।

অতএব উলামায়ে কেরামের এসকল উক্তি থেকে এ কথা বোঝা গেল যে, সকল বয়সের মুসলমান নারী-পুরুষের জন্য কোরআন শরীফ শেখা এবং শেখানোর ব্যবস্থা করা চাই। যদিও তারা নিয়মতান্ত্রিকভাবে আরবী ব্যাকরণ নাহু সরফ ইত্যাদি শিখতে সক্ষম না হয়।

চার.

হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন,

পবিত্র কোরআনের শিক্ষা ছোট-বড়, আওয়াম-খাওয়াস সকলের জন্য একান্ত কাম্য। এর মাঝে কোরআনের তরজমাও অন্তর্ভুক্ত। কেননা আযমী লোকদের তরজমার সাথে সম্পর্ক এমন, যেমন আরবদের মূল আয়াতের সাথে সম্পর্ক। আর আরবের আরবী ভাষাভাষী জনসাধারণকে কখনোই কোরআন শিক্ষা থেকে বারণ করা হয় না বা তাদেরকে বঞ্চিত করা হয় না। তাই অনারবী জনসাধারণকে কোরআনের তরজমা শেখা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না, বাদ দেওয়া যাবে না। তবে যদি কোনো

ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বক্রতার কারণে কোনো ধরনের মাফাসিদ, খারাবি পরিলক্ষিত হয় তাহলে সে সকল খারাবিকে দূর করা হবে। আর এ সকল খারাবি দূর করার পন্থা সম্পূর্ণ ইজতিহাদি। উপস্থিত বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা দ্বারা করতে হবে। এ

ক্ষেত্রে সংশোধনকারীদের মতামত ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। কাজেই অধম নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এর জন্য কয়েকটি মূলনীতি লিখে দিচ্ছি।

১. তরজমার শিক্ষক পূর্ণ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আলেম হতে হবে। যাতে করে তরজমা ব্যাখ্যা এবং বিষয়বস্তুর তাফসীর নির্বাচনের মাঝে শ্রোতাদের ধারণক্ষমতা, বুঝশক্তির প্রতি পরিপূর্ণ লক্ষ রাখতে পারে।

২. শিক্ষার্থীরা সমঝদার এবং নিজের অনুগত হওয়া, যাতে তাফসীর বোঝার ক্ষেত্রে মনগড়া পথ অবলম্বন না করে এবং তাফসীর বুঝতে ভুল না করে।

৩. যদি কোনো বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর বুঝের উর্ধ্বে হয় সে ক্ষেত্রে শিক্ষক তাকে বলে দেবে যে, স্থানটি শুধুমাত্র তোমাদেরকে বরকতের জন্য পড়ে নাও। অথবা মোটামুটি বিষয়টি সংক্ষেপে বুঝে নাও এর চেয়ে বেশি আর কিছু বোঝার পেছনে পড়ো না। আর শিক্ষার্থীও এমন হতে হবে, যাতে সহজে সে শিক্ষকের এ কথা মেনে নিতে পারে। যদি ১ নং-এ বর্ণিত গুণে গুণান্বিত শিক্ষক পাওয়া না যায় তাহলে এ সকল স্থানে একেবারেই কোনো ধরনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করবে না, শুধুমাত্র অনুবাদ পড়ে শুনিয়ে দেবে। আমাদের গ্রামের অধিকাংশ মেয়েরা কোরআন মাজীদের তরজমা পড়ে থাকে। কিন্তু সেটা এভাবে যে, শুধুমাত্র অনুবাদের মূল পাঠ তারা পড়ে নেয়, শিক্ষিকা এর ওপরে কোনো ব্যাখ্যা করে না। আর শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র বরকত অর্জনের জন্য পড়ে থাকে আর সহজে যতটুকু পারা যায় বুঝে নেয়।

এরপর প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা যখন পূর্ণাঙ্গ তাফসীর পড়ার যোগ্যতা অর্জন করবে, চাই এ বিষয়ে কিছু কিতাব পড়াশোনার মাধ্যমে অথবা উলামায়ে কেরামের সোহবতে থেকে, তখন পুনরায় কোনো আলেমের কাছ থেকে অনুবাদ পরিপূর্ণ তাফসীর এর সাথে পড়ে নেবে। প্রাথমিক শিক্ষাকে যথেষ্ট মনে করে বসে থাকবে না।

এ ধরনের কোরআন তরজমা শিক্ষার ব্যাপারে কোরআন-হাদীসে বহু দলিল রয়েছে সেগুলো কিছু মূলনীতি এবং শর্ত সাপেক্ষে মেনে নিতে হবে। যেমন–শর্ত দিয়েছেন আব্দুল কাদের সাহেব (র.)।

অনুরূপভাবে উস্তাদ ছাড়া যারা তরজমা এবং তাফসীরের মুতালা করে থাকে তাদের জন্য কোনো কোনো মুহাক্কিক একই শর্ত দিয়ে থাকেন। আর যেখানে কোনো উস্তাদ পাওয়া না যায় সেখানে তাঁরা বলে থাকেন প্রথমে প্রাথমিক দ্বীনি শিক্ষাগুলো অর্জন করে নাও, যাতে করে উলুমূল কোরআনের সাথে কিছুটা সম্পর্ক হয়ে যায়। অতঃপর কোরআনের তরজমা ও তাফসীর অধ্যয়নকালে যেখানে কোনো সন্দেহ দেখা দেবে, সেখানে নিজের চিন্তা ও গবেষণা দ্বারা সিদ্ধান্ত না নিয়ে স্থানটি চিহ্নিত করে রাখবে এবং যখন কোনো মুহাক্কিক আলেম পাবে তার কাছ থেকে সেই স্থানটি বুঝে নেবে।

আবার অনেকেই সর্বসাধারণের জন্য কোরআনের অনুবাদ শেখাকে নিরাপদ মনে করেন না, নিষেধ করে থাকেন। তাঁদের এই নিষেধ করাটাও ওই সকল খারাবির প্রতি লক্ষ করে, যা বাস্তবে দেখা দেয়। যার কারণ এ সকল শর্তের প্রতি লক্ষ না রাখা। কাজেই এ সকল খারাবি দূর করার জন্য উল্লিখিত শর্তসমূহ পালন করে মাফাসিদগুলোকে দূর করা যেতে পারে এবং সর্বসাধারণকে কোরআন তরজমা শেখার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। (বাওয়াদিরুননাওয়াদির, পৃষ্ঠা-৩২৯- ৩৩৪)

কোরআনের তরজমা বিকৃতি :

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ আসমানী কিতাবের মাঝে রদবদলের ঘটনা মানব ইতিহাসের এক কলঙ্কিত অধ্যায়। যার সূচনা ইহুদি-খ্রিস্টান কর্তৃক তাওরাত ও ইঞ্জিলে বিকৃতি সাধনের মাধ্যমে হয়েছে। ইসলাম ধর্ম আগমনের বহু পূর্বে এই আসমানী কিতাবদ্বয় সংযোজন-বিয়োজনের শিকার হয়ে তার আসল রূপ হারিয়ে ফেলে। এক দল অর্থলিপ্সু রাহেব ও পাদ্রিদের অন্যায় হস্তক্ষেপের দরুন এই করুণ পরিণতির শিকার হয় আসমানী কিতাব।

পবিত্র কোরআনে তাদের এই অপকর্মের সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে এবং ধিক্কার দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে,

"অতএব তাদের জন্য আফসোস, যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। অতএব তাদের প্রতি আক্ষেপ তাদের হাতের লেখার জন্য এবং তাদের প্রতি আক্ষেপ তাদের উপার্জনের জন্য।" (সূরা আল-বাকারা ৭৯)

ইহুদি-খ্রিস্টান পণ্ডিতগণ আসমানী কিতাবের মাঝে যে বিকৃতি সাধন করে তা মৌলিকভাবে চার ধরনের। ক. শব্দ সংযোজন। খ. শব্দ বিয়োজন। গ. শব্দ পরিবর্তন। ঘ. অর্থ পরিবর্তন। (বাইবেল সে কোরআন তক ২/১৩)

আসমানী কিতাব বিকৃতির এ সকল চোরা দরজা বন্ধ করার জন্য ইসলামী মনীষীগণ কোরআনের তরজমা ও তাফসীর সংকলনের কিছু মূলনীতি ঠিক করে দিয়েছেন। যেমন, কাব্যের মাধ্যমে অনুবাদ না করা বা মূল পাঠ বাদ দিয়ে শুধু অনুবাদ প্রকাশ না করা ইত্যাদি।

কাব্যানুবাদের শরয়ী বিধান :

সুন্দর, শালীন, মার্জিত এবং ইসলামী চিন্তা-দর্শন ও জীবন বিধান সমর্থিত কাব্যচর্চার সীমিত পরিসরে অনুমতি থাকলেও সামগ্রিক বিবেচনায় শরীয়তে কাব্য চর্চার প্রতি খুব একটা উৎসাহিত করা হয়নি। কোরআনের অপার্থিব ছন্দময়তার কারণে লোকেরা কোরআনুল করীমকে কাব্যগ্রন্থ আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়াসাল্লামকে কবি মনে করতে লাগলে আল্লাহ তা'আলা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন وما هو بقول شاعر (سورة الحاقة)

'আর এটা কবির কাব্যসমগ্র নয়'। (সূরা আল হাক্কাহ-৪১)।

কাজেই কোরআন কাব্যগ্রন্থ নয়, বরং কোরআনে করীম হচ্ছে হেদায়াতের বাণীসম্বলিত ঐশীগ্রন্থ। আর কবি তো কখনো কখনো তার পদ্য ও পঙক্তির ছন্দ রক্ষায় উপযুক্ত শব্দ চয়ন ও বাক্য গঠনে নিয়ন্ত্রণহীনতা ও উদ্ভ্রান্তির শিকার হয়ে যায়। পক্ষান্তরে কোরআনে করীম হেদায়াতের কিতাব হিসেবে এর প্রতিটি শব্দ ও অর্থ উভয়টাই সীমাহীন তাৎপর্যপূর্ণ। এর ধারা-ব্যঞ্জনা ও বর্ণনাশৈলীর অলঙ্করণ স্পর্শ করা মানুষের সাধ্যের বাইরে। আরবী ভাষার গভীর বুৎপত্তি ছাড়া যা সঠিকভাবে অনুধাবন করা অসম্ভব। তাই ইসলামী ইতিহাসের সূচনাকাল থেকেই ভিন্ন ভাষায় কোরআনে করীমের অনুবাদ করা যাবে কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট মতভিন্নতা ছিল। তবে ভিন্ন ভাষাভাষীদের বোঝার স্বার্থে কালামে পাক থেকে যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন মুফাসসির যে অর্থ ও মর্ম অনুধাবন করেন, তা অনারবী ভাষায় ব্যক্ত করা ও লেখার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এ জন্য এটাকে "তরজমাতুল কোরআন" না বলে মুহাক্কিকগণ "তরজমাতু মাআনিল কোরআন" বলাকেই সঙ্গত মনে করেন।

এখন সেই মর্মবাণীর কাব্যিক রূপ প্রদানের ক্ষেত্রে অন্ত্যমিল, ছন্দ ইত্যাদির প্রয়োজনে সঠিক মর্মের প্রকাশ ব্যাহত হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। অথবা প্রকাশ সঠিক হলেও শ্রোতা বা পাঠক বিভ্রান্ত হতে পারে। এই আশঙ্কার প্রতি লক্ষ করে ফুকাহায়ে কেরাম কোরআনের কাব্যানুবাদের প্রতি কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য কিছু ফাতাওয়া তুলে ধরা হলো।

এক.

বিখ্যাত ফাতাওয়াগ্রন্থ আলমগীরীতে এসেছে,

رجل نظم القرآن بالفارسية يقتل، لأنه كافر كذا في التاتارخانية (الهندية ٢/٢٦٧)

যে ব্যক্তি ফার্সি ভাষায় কোরআনের কাব্যিক অনুবাদ করবে সে কাফের। (২/২৬৭)

দুই.

ফকীহুন্নফস হযরত মাও. রশিদ আহমদ গাংগুহী (রহ.) এক ফাতাওয়ায় উল্লেখ করেন,

علی ہذا قران کو نظم کرنا اور فارسی کرنا تغیر کتاب اللہ تعالی کی اور نظم منزل کو بدلنا اہانت و بے تعظیمی قران کی ہوئی سو کفر ہو گیا فقط والسلام (فتاوی رشیدیہ ٥٧)

"কোরআনকে ফার্সি কাব্যে রূপান্তর করা কিতাবুল্লাহ বিকৃতির শামিল আর আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ ছন্দ পরিবর্তন করা কোরআন অবমাননার শামিল। কাজেই এটা কুফুরি হয়ে গেল।" (ফাতাওয়ায়ে রশিদিয়া, পৃষ্ঠা- ৫৭)

তিন.

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) এসংক্রান্ত বিস্তারিত এক ফাতাওয়ায় লেখেন,

কাব্যানুবাদের মাঝে একটি বড় সমস্যা হলো হুবহু অনুবাদের সংরক্ষণ সম্ভব হয় না। ছন্দ এবং ওজন ঠিক রাখতে গিয়ে কমবেশ হয়ে যায়। হ্রাস না হলেও বৃদ্ধি অবশ্যই হয়ে যাবে। আর যদি সেটা শব্দের নিচে নিচে লেখা হয় তাহলে পাঠক পুরাটা অনুবাদ বলে মনে করবে। অথচ সেখানে তরজমা থেকে অতিরিক্ত শব্দও রয়েছে। আলোচ্য অনুবাদের একটি পঙক্তিও এর ব্যতিক্রম নয়। সবগুলোর মাঝে শব্দ কমবেশ করা হয়েছে। তবে নগণ্যসংখ্যক এর ব্যতিক্রম রয়েছে, যা আলোচনার মতো নয়। এ ব্যাপারে প্রথম পাড়ার শেষে বিশেষ দ্রষ্টব্য বলে লেখক ওজর পেশ করে বলেছেন,

'যে সকল শব্দ বিভিন্ন স্থানে কোনো প্রয়োজনে বৃদ্ধি করা হয়েছে তা শুধুই অনুবাদকে ফুটিয়ে তোলার জন্য করা হয়েছে। আর তাও কোরআনে বর্ণিত 'আলিফ-লাম' বা 'তানভীন'-এর অর্থ

প্রকাশের জন্য অথবা কোনো উহ্য শব্দের অর্থ ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যে আনা হয়েছে। অতিরিক্ত শব্দ হিসেবে তা আনা হয়নি। লেখকের এই মন্তব্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঠিক আছে তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়।...

কাব্যানুবাদের আরেকটি সমস্যা হলো যদি কোরআনের শব্দগুলো অনুবাদের শব্দের বিপরীতে উল্লেখ করে শব্দে শব্দে মিল মিল রেখে অনুবাদ করা হয়, তাহলে কবিতার দুই পঙক্তির মাঝে ফাঁকা বিদ্যমান থাকার কারণে কোরআনের শব্দের মাঝেও ফাঁকা তৈরি হবে। অতএব আলোচ্য কাব্যানুবাদটির মাঝে এমনই হয়েছে। কাজেই এখানে পবিত্র কোরআনকে তরজমার অনুগত করা হচ্ছে, যা উদ্দেশ্য পরিপন্থী। তা ছাড়া কোরআনের শব্দকে বিচ্ছিন্ন করে লেখার দোষে দুষ্ট হচ্ছে। আর লেখা অনুসারে তেলাওয়াত করা মানুষের সাধারণ অভ্যাস। তাই এ ধরনের শব্দ তেলাওয়াতের সময় সন্দেহ সৃষ্টি হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ ধরনের ফাঁকা থাকার দরুন অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়, যা আলেমদের কাছে অজানা নয়। আর যদি কোরআনের শব্দের মাঝে ফাঁকা না রাখা হয় তাহলে শব্দে শব্দে অনুবাদ মেলাতে গিয়ে কোন শব্দের অনুবাদ কোনটি, তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দেবে। কাজেই উল্লিখিত উভয় পদ্ধতি পরিহার আবশ্যক।

এ সকল সমস্যা এতই গুরুতর যে কাব্যানুবাদে যদি কোনো উপকারিতাও থাকে তবুও এই সমস্যা থাকা অবস্থায় তার ধর্তব্য হবে না। শরীয়তের একটি মূলনীতি আছে, যে আমল অত্যাবশ্যক নয় যদিও তা মুস্তাহাব হয় আর তাতে কোনো ফ্যাসাদ দেখা দেয় তাহলে ওই আমল পরিহার করা ওয়াজিব। এখানে ওই আমলের সৌন্দর্য বা উপকারিতার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হয় না। এ মূলনীতির ভিত্তিতে বহু মাসায়েল প্রণীত হয়েছে। আর কাব্যানুবাদের মাঝে এমন কোনো মাসলাহাত বা উপকারিতা নেই। ভূমিকায় যে কয়টি উপকারিতা উল্লেখ করা হয়েছে যেমন, 'ছন্দে ছন্দে মিলিয়ে অনুবাদ করা হলে মুসলমানরা খুব আগ্রহ করে এর অধ্যয়ন করবে। বিশেষ করে আগামীতে ছোট ছোট বাচ্চাদের বিভিন্ন গজল-কবিতার পরিবর্তে এগুলো মুখস্থ করানো হবে।'

অথচ এই উপকারিতার মাঝেই ফ্যাসাদের স্বীকারোক্তি রয়েছে। কারণ এর পরিণতি এটাই হবে যে, গজলের স্থলে এটা সুর করে গাইবে। কারণ ছন্দ আর সুর ছাড়া তো মজা হবে না। বিশেষ করে পেশাদার বক্তা যারা সব সময় মাঠ গরম করার ফিকিরে থাকে, তারা এটা নিয়ে সুর করবে। আর বক্তাদের প্রভাব সাধারণের ওপর পড়বে। ফলে তাদের মাঝেও এই সুর করার পদ্ধতিটি ভক্তিসহকারে চর্চিত হতে থাকবে। গানের হুকুম সবার জানা আছে। বিশেষ করে পবিত্র কোরআনকে গানের উপকরণ বানানোর হুকুম। তা ছাড়া কাব্যের মাঝে গাম্ভীর্যতা এবং আজমত থাকে না। এই রহস্যের কারণে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ(سورة يس٦٩)

"আমি রাসূলকে কবিতা শিক্ষা দিইনি এবং তা তাঁর জন্য শোভনীয় নয়। এটা তো এক উপদেশ জিকির ও প্রকাশ্য কোরআন।" (সূরা ইয়াসীন-৬৯)

তদ্রুপ খুতবাও এক প্রকার জিকির। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ(سورة الجمعة ٩)

"তখন আল্লাহর জিকিরের পানে ত্বরা করো।" (সূরা জুমুআ)

তাই আমাদের আসলাফগণ ছন্দময় খুতবা পরিহার করেছেন।

রইল সহজে মুখস্থ হওয়ার মাসলাহাত। তো আরবী ভাষার নিয়ম-কানুন জানা থাকলে অনুবাদ মুখস্থ করার প্রয়োজন নেই। আর যদি তা জানা না থাকে তাহলে মুখস্থ করার মাঝে কোনো ফায়দা নেই। কারণ অর্থ যদি না বোঝে তাহলে কোন পঙক্তি কোন শব্দের অনুবাদ, তা কী করে মুখস্থ রাখবে। তাহলে মুখস্থ করা না করা বরাবর হয়ে গেল। তা ছাড়া এ সকল উপকারিতার প্রতি লক্ষ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তাহলে আগামীতে কোরআন তেলাওয়াতের প্রতি মানুষের আগ্রহ নেই–এ কথা বলে কেহ আগ্রহ তৈরির জন্য কোরআনের আয়াতগুলোকে কবিতার মতো বানিয়ে দেবে। আর তা করতে গিয়ে অতিরিক্ত যা কিছু যোগ করা হবে, ভিন্ন ফন্টের লেখা দিয়ে তা চিহ্নিত করে দেবে। তাহলে এটা কি জায়েয হবে? আজ পর্যন্ত উম্মতের মাঝে কেউ যথেষ্ট ভাষা-জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও এমন কাজ করেনি। এই না করার ওপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। তাই এর বিরোধিতা করা নাজায়েয। (ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/ ৫১, ৮/ ৪৬৩)

চার.

মুফতী শাব্বির আহমদ কাসেমী (দা.বা.) এ প্রসঙ্গে এক ফাতাওয়ায় বলেন,

পবিত্র কোরআনের কাব্যানুবাদে চার ধরনের খারাবি রয়েছে।

১. কাব্যানুবাদ করা হয় দিল দেমাগের প্রফুল্লতা বা বিনোদনের উদ্দেশ্যে। আর পবিত্র কোরআনকে বিনোদনের উপকরণ বানানো মারাত্মক ধরনের কবিরা গোনাহ।

২. পবিত্র কোরআনে যে মানের ভাষা-সাহিত্য বিদ্যমান আছে তার ছিটেফোঁটাও অনুবাদের কবিতায় আসতে পারে না।

৩. ছন্দময় অনুবাদ হলে পাঠকের দৃষ্টি ছন্দের মাঝেই নিবদ্ধ হয়ে পড়বে। ফলে কোরআনের অনুবাদ এবং মর্ম গভীরভাবে অনুধাবন করে তার অন্তর্নিহিত শিক্ষাকে

ধারণ করার প্রতি কোনোরূপ ভ্রুক্ষেপ করা হবে না।

৪. ছন্দ মেলাতে গিয়ে অনুবাদের মাঝে হ্রাস-বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী হয়ে থাকে। যা পবিত্র কোরআনের অর্থ ও মর্মের মাঝে মারাত্মক বিকৃতি হিসেবে বিবেচ্য। তাই যেকোনো ভাষায় পবিত্র কোরআনের কাব্যানুবাদ সম্পূর্ণ নাজায়েয। (ফাতাওয়া কাসিমিয়া-৩/৫১২)

মূল আয়াত ছাড়া অনুবাদ :

পবিত্র কোরআনের মূল আয়াত উল্লেখ না করে শুধু অনুবাদ প্রকাশ করা কোরআন বিকৃতির আরেক পদ্ধতি। এভাবে এক-দুই আয়াত লেখার অনুমতি আছে কিন্তু পুরা কোরআন লেখার অনুমতি নেই। হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) এসংক্রান্ত এক ফাতাওয়ায় লেখেন,

আহলে বাতিল অমুসলিম, বিশেষ করে আহলে কিতাবদের সাদৃশ্য অবলম্বন করার নিন্দা এবং ক্ষতিকর হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট দলিল দ্বারা প্রমাণিত।

উক্ত হাদীসের মাঝে এর ভয়াবহ পরিণতি উল্লেখ হয়েছে। من تشبه بقوم فهو منهم এখানে কাফেরদের সাদৃশ্য অবলম্বনকে তাদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণ বলা হয়েছে।

অপর হাদীসে আছে,

لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ(ترمذى ٢١٨٠)

এখানে তাদের এই সাদৃশ্যকে তিরস্কার করা হয়েছে। আর এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে আল্লাহর কিতাবের তরজমা মূল আয়াত ছাড়া প্রকাশ করা এমন বিষয় যা আহলে কিতাবদের সাদৃশ্য অবলম্বনে নামান্তর, যা উরফ এবং অভ্যাস হিসেবে তাদের বৈশিষ্ট্য। এমনিতেই তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন ধিকৃত তার ওপর আবার দ্বীনি বিষয়। পার্থিব বিষয়ের সাদৃশ্যের চেয়ে দ্বীনি বিষয়ের সাদৃশ্য গুরুতর।.....(ইমদাদুল ফাতাওয়া-৮/৮৮৮ জাদীদ)

দুই.

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) লেখেন,

কোরআন মাজিদের মূল আরবী বাদ দিয়ে শুধু তরজমা লেখা বা লেখানো এবং প্রকাশ করা উম্মতের সর্বসম্মতি ক্রমে হারাম এবং ইমার চতুষ্টয়ে ঐকমত্যে নিষেধ। যেমনটি নিম্নের বর্ণনা থেকে প্রমাণিত। এর লেখা এবং প্রকাশ করা যেহেতু নাজায়েয তাই ক্রয়-বিক্রয়ও গোনাহের কাজে সহযোগিতা হওয়ায় নাজায়েয। কাজেই এর ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে গোনাহগার হবে। আর প্রকাশক ও প্রচারকের নিজের বদআমলের গোনাহের সাথে সাথে যত মুসলমান এর ক্রয়-বিক্রয়ের দরুন গোনাহগার হবে সেও তার ভাগিদার হবে।...

(যাওয়াহিরুল ফিকহ-৯৭)

অনুবাদক ও অনুবাদের শর্তাবলি :

১. অনুবাদক দ্বীনদার, পরহেজগার এবং আমানতদার হওয়া। বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাসের ধারক হওয়া।

২. অনুবাদক কোনো ধরনের ভ্রান্ত মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া। অন্যথায় তার অনুবাদের মাঝে ভ্রান্ত মতাদর্শ মিশ্রণের সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

৩. উভয় ভাষায় দক্ষ হওয়া। শব্দমালা চয়ন, বাক্য গঠন এবং অলঙ্করণ জানা থাকা, যাতে অনুবাদের মাঝে সঠিক ভাব ফুটিয়ে তুলতে পারে।

৪. শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) কৃত 'আল-ফাউযুল কাবির' গ্রন্থে উল্লিখিত পনেরো প্রকার ইলমে পারদর্শী হওয়া।

৫. অনুবাদক যদি যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন আলেম হন তবে নিজ থেকে অনুবাদ করতে পরবে, অন্যথায় কোনো গ্রহণযোগ্য অনুবাদ অনুসরণ করতে হবে।

৬. মানুষকে সত্যের সন্ধান দেওয়ার উদ্দেশ্যে অনুবাদ করা।

৭. কোরআনের সমতুল্য একটি ছোট আয়াতও উপস্থাপনে মানুষের অপারগতার বিষয়টি তুলে ধরা।

৮. ইসলামে যাবতীয় শিক্ষা সঠিকভাবে ফুটিয়ে তোলা।

৯. ইসলামের ওপর আরোপিত সকল সন্দেহ দূর করা।

১০. অমুসলিমদের কছে কোরআনের আলো পৌছে দেওয়া।

১১. ইসলাম প্রচারের গুরুদায়িত্ব পালনের মানসিকতা রাখা।

১২. কোরআন তিলাওয়াত ইসলামের একটি মৌলিক ইবাদত। তাই মূল কোরআনের তিলাওয়াতকে ইবাদত মনে করা। অনুবাদের কারণে যেন মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখা।

১৩. নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থসমূহকে মূল ভিত্তি বানিয়ে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে অনুবাদ করা। যাতে কোরআন-সুন্নাহ এবং ইসলামের মৌলিক শিক্ষার সাথে কোনো প্রকার সংঘর্ষ না হয়।

১৪. মূল আয়াত আরবীতেই উল্লেখ করতে হবে। অন্য কোনো ভাষায় আয়াতের উচ্চারণ লেখা যাবে না।

১৫. প্রথমে মূল আরবী আয়াত লিখতে হবে। এরপর নিচে অথবা পাশের কলামে অনুবাদ লিখবে। শুধু অনুবাদ লেখার অনুমতি নেই।

১৬. কাব্যের ছন্দে অনুবাদ করা যাবে না। সাদামাটা, সাবলীল ভাষায় অনুবাদ হতে হবে।

১৭. অনুবাদটি কোনো বিজ্ঞ আলেমের সাহায্যে বুঝতে হবে, নিজে নিজে বুঝতে গেলে অনেক ভুল-ভ্রান্তি হতে পারে। এ বিষয়টি অনুবাদের ভূমিকায় স্পষ্ট করতে হবে।

(আত্-তাফসীর ওয়াল মুফাস্-সিরুন, আল ইতকান ফি উলূমিল কোরআন, এমদাদুল ফাতাওয়া)

শরীয়তের দৃষ্টিতে ই-বাণিজ্য-২

মুফতী আব্দুল্লাহ নুমান

ই-বাণিজ্যের প্রকার

ই-বাণিজ্যিক লেনদেন কর্মকাণ্ডের পরিধি সুবিশাল। তবে এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ধরন হিসেবে প্রকার রয়েছে চারটি।

১. বিটুবি (Business to business)
২.বিটুসি (Business to consumer)
৩. বিইন্টারবি (Business enter business)
৪. সিটুসি (Consumer to consumer)

১. বিটুবি (Business to business) :

এই ধরনের ই-বাণিজ্যিক লেনদেনে যুক্ত উভয় পক্ষই ব্যবসায়ী হয়ে থাকে। তাই এর নামকরণ করা হয় বিটুবি, অর্থাৎ বিজনেস টু বিজনেস। জনকল্যাণকর পণ্য উৎপাদন এবং মূলধন সংরক্ষণের জন্য একজন ব্যবসায়ীকে আরো কয়েকজন ব্যবসায়ীর সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং যোগাযোগ রাখতে হয়। যারা হয়তো বিভিন্ন প্রকারের কাঁচামাল সরবরাহ করে থাকে অথবা এমন কিছুর অংশীদার হয়ে থাকে, যার মাধ্যমে ব্যবসায়ী নিজের পণ্য গ্রাহকদের মাঝে বণ্টন করে। যেমন মোটরযান তৈরিকারী ইঞ্জিনিয়ারের পার্টস তৈরিকারী আরেকজন ইঞ্জিনিয়ারের অনেক বেশি প্রয়োজন রয়েছে। অথচ যে কিনা নিজেই একজন ইঞ্জিনিয়ার। শুধুমাত্র একজন সরবরাহকারীর ওপর থেকে সীমাবদ্ধতাকে দূর করার জন্য মোটরযান তৈরিকারী প্রতিষ্ঠান প্রতিটি পার্টসের জন্য একের অধিক বিক্রেতার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে এবং অনেকগুলো কম্পিউটারের সাহায্যে পরিচালিত একটি নেটওয়ার্ককে অর্ডার দেওয়া, উৎপাদিত পণ্যের রক্ষণাবেক্ষণ, পার্টসের সংরক্ষণ এবং বিল পরিশোধের জন্য ব্যবহার করে থাকে। এইভাবে একজন ব্যবসায়ী নিজের সরবরাহ প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী এবং উন্নত করতে পারে। ই-বাণিজ্যের ব্যবহার বিভিন্ন ঘোষণা এবং ডকুমেন্টের স্থানান্তরকে দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করে। এবং কিছুদিন আগ থেকেই টাকার লেনদেনও এর সাহায্যে হচ্ছে। ঐতিহাসিক মতে, ই-বাণিজ্যের সূচনা বিটুবির লেনদেনকে সহজলভ্য করার জন্য হয়েছিল, যেখানে ইলেকট্রনিক ডাটা ইন্টারচেঞ্জ (EDI) টেকনিকের সাহায্যে বাণিজ্যিক ডকুমেন্টসমূহ যেমন চালানপত্র আদান-প্রদান করা হতো।

২. বিটুসি (Business to consumer) :

যেমনটা নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে, বিটুসি (Business to consumer) লেনদেনের ক্ষেত্রে একদিকে ব্যবসায়ী এবং অন্যদিকে তার গ্রাহক হয়ে থাকে। এর দ্বারা শুরুতেই যে কারো অনলাইন শপিংয়ের কথা মনে পড়বে। কিন্তু এ কথা জানা আবশ্যক যে ক্রয়-বিক্রয় মার্কেটিংয়ের কাজের একটি প্রকার এবং মার্কেটিংয়ের কাজ পণ্য বিক্রয়ের জন্য দেওয়ার পূর্বেই শুরু হয়ে যায় এবং এটা তা ক্রয় করার পর পর্যন্ত চলতে থাকে। এ জন্য বিটুসির ক্ষেত্রে মার্কেটিং কর্মকাণ্ডের বৃহৎ পরিসর রয়েছে। যেমন পরিচয় কর্মকাণ্ড, উন্নয়ন-অগ্রগতি এবং কিছু ক্ষেত্রে তো পণ্যের হস্তান্তর পর্যন্ত, যা অনলাইনের মাধ্যমে পৌঁছানো যায়। ই-বাণিজ্যের মাধ্যমে এসব কর্মকাণ্ড অতিদ্রুততার সাথে এবং যৎসামান্য খরচে পরিচালনা করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ এটিএমের মাধ্যমে টাকা দ্রুততার সাথে বের করা যায়। বর্তমান সময়ের গ্রাহক অনেক বেশি যাচাই-বাছাইকারী, তারা চায় তাদের প্রত্যেকের দিকে যেন বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া হয়। তারা শুধুমাত্র নিজেদের প্রয়োজন অনুপাতে তৈরীকৃত পণ্য বিশেষভাবে চায় না বরং তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী মূল্য পরিশোধ এবং পণ্য হস্তান্তরের ক্ষেত্রে সহজলভ্যতাও চেয়ে থাকে। ই-বাণিজ্যের মাধ্যমে এসব কাজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে। এ ছাড়া ই-বাণিজ্যের বিটুসি বিশেষভাবে লেনদেনকে ২৪ ঘণ্টা গ্রাহকদের সাথে যোগাযোগ রাখার যোগ্য করে দেয়। কোম্পানিসমূহ কে কী ক্রয় করছে এবং গ্রাহকদের ভরসার ভিত্তি কিসের ওপর তা জানার জন্য অনলাইনে পর্যবেক্ষণও করতে পারে।

এখন হয়তো আপনার এটা ধারণা হয়ে গেছে যে বিটুসি একপক্ষীয় ট্রাফিক, অর্থাৎ ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে গ্রাহকদেরকে। কিন্তু এটি স্মরণ রাখতে হবে যে বিটুসি বাণিজ্য বর্তমানে অনেক বড় পরিসরে একটা বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে, যা গ্রাহকদেরকে নিজেদের ইচ্ছামাফিক ক্রয়/শপিং করার স্বাধীনতা দিয়ে থাকে। গ্রাহক কোনো বিষয়ে জানার জন্য এবং কোনো অভিযোগ দায়ের করার জন্য কোম্পানির পক্ষ থেকে বিদ্যমান কল সেন্টারের সাহায্য

নিতে পারে।

৩. বিইন্টারবি (Business enter business) :

এখানে ইলেকট্রনিক লেনদেনে যুক্ত উভয় পক্ষই লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত হয়। এ জন্যই এর নাম বিইন্টারবি বাণিজ্য রাখা হয়েছে। যাতে ইন্টারনেটের ব্যবহার প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত বিভিন্ন সেক্টর এবং লোকদের মাঝে লেনদেন ও যোগাযোগ প্রক্রিয়ার জন্য করা হয়ে থাকে। এসবই ইন্টারবি বাণিজ্যের অবদান যে বর্তমানে প্রতিষ্ঠানসমূহ চটচটে উৎপাদনের যোগ্য হয়ে গেছে। কম্পিউটার নেটওর্য়াকের সাহায্যে মার্কেটিং সেক্টর সর্বদা উৎপাদনকারী সেক্টরের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখতে পারে এবং ভোক্তা সমাজের প্রয়োজন অনুপাতে উৎপাদন করে থাকে। এইভাবে অন্যান্য সেক্টরের সাথে কম্পিউটারভিত্তিক যোগাযোগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের বহু উপকার অর্জিত হয়ে থাকে।

৪. সিটুসি (Consumer to consumer) :

এখানে লেনদেনের শুরু এবং শেষ উভয়টি গ্রাহকদের পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। এ জন্য এর নাম সিটুসি বাণিজ্য। এই ধরনের ই-বাণিজ্য ওই ধরনের পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য খুবই উপযোগী। যেগুলোর বিদ্যমান কোনো বাজারব্যবস্থা নেই। উদাহরণস্বরূপ ব্যবহৃত বই অথবা পোশাকাদি নগদে বা অন্য কোনো পণ্যের বিনিময়ে বিক্রয় করা। বিক্রয়কারীদের জন্য আন্তর্জাতিক ই-বাণিজ্য এই সমস্ত লেনদেনের নিশ্চয়তা প্রদান করে থাকে, যাতে ক্রেতা এবং বিক্রেতা একে অন্যের সাথে অপরিচিত হয়েও নির্বিঘ্নে লেন-দেন করতে পারবে। যার উৎকৃষ্ট উদাহরণ বিভিন্ন নিলামকারী ওয়েবসাইটের মধ্যে পাওয়া যায়। যেখানে গ্রাহকরা নিজেদের পণ্য বা সেবা অন্য গ্রাহকদের কাছে বিক্রি করে থাকে। উক্ত কর্মকাণ্ডকে অধিকতর সুরক্ষিত এবং শক্তিশালী বানানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের টেকনিক প্রয়োগ করা হয়। সিটুসি কর্মকাণ্ডের সাহায্যের জন্য আরেকটি নতুন টেকনিক আবিষ্কার হয়, তা হলো মূল্য পরিশোধের জন্য মধ্যস্থতাকারী হওয়া। এই ধরনের টেকনিকের একটা উদাহরণ হলো বিভিন্ন পেমেন্ট গেটওয়ে সাইট। একজন অপরিচিত, অনির্ভরযোগ্য বিক্রেতার কাছ থেকে সরাসরি পণ্য ক্রয় করার পরিবর্তে ক্রেতা পেমেন্ট গেটওয়ে সার্ভিসে টাকা পাঠাতে পারে। সেখান থেকে তা বিক্রেতাকে জানিয়ে দেবে যে টাকা তারা পেয়ে গেছে এবং পণ্য ক্রেতার কাছে পৌঁছার আগ পর্যন্ত টাকা তাদের নিকট থাকবে। ই-বাণিজ্যের পরিধি সম্পর্কীয় উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে ই-বাণিজ্যের প্রয়োগ বিভিন্ন প্রকারের কর্মকাণ্ডের ওপর হয়ে থাকে। (কারূবারী মুতালা'আ, পৃ. ১৩০-১৩৪)

ই-বাণিজ্য শরয়ীসিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ :

সর্বপ্রথম এখানে একটি মৌলিক নীতিমালা বুঝে নেওয়া আবশ্যক যে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির যে সমস্ত নীতিমালা এবং পদ্ধতি শরীয়তে নির্ধারিত ও ফুকাহায়ে কেরামগণ যার সুস্পষ্ট বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা করেছেন, ওই সমস্ত নীতিমালা এবং পদ্ধতি যদি কোনো ক্রয়-বিক্রয়ে পাওয়া যায়, চাই তা পুরনো কোনো পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয় হোক বা নিত্যনতুন আবিষ্কৃত কোনো পদ্ধতিতে হোক, ঠিক তেমনি ইজারাবিষয়ক যে নীতিমালা এবং পদ্ধতি শরীয়তে পূর্ব থেকেই নির্ধারিত সেগুলোই নিত্যনতুন আবিষ্কৃত ইজারা পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা হবে। সুতরাং এটাই দেখতে হবে যে শরীয়তের যে মৌলিক নীতিমালা ক্রয়-বিক্রয় এবং ইজারাবিষয়ক রয়েছে, তা এই নব আবিষ্কৃত ই-বানিজ্য পদ্ধতিতে পাওয়া যায় কিনা? যদি পাওয়া যায় তাহলে তা বৈধ আর যদি পাওয়া না যায় তাহলে তা অবৈধ বলে গণ্য হবে।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিক যুগের ফকীহগণ প্রত্যেকেই ই-বাণিজ্যের বৈধতার পক্ষে মত দিয়েছেন। সমসাময়িক মুফতীগণের ফাতাওয়ায় ই-বাণিজ্য বৈধ বলে প্রতীয়মান হয়। তাঁরা প্রত্যেকেই শর্তারোপ করেছেন, শরীয়তে হারাম এরূপ কোনো কিছু এর সাথে থাকতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে মোট চারটি শর্তের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা হয়ে থাকে। তা হলো, লেনদেন শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে সম্পন্ন হওয়া, তাতে গারার (অনিশ্চয়তা), জাহালত (অজ্ঞতা) এবং প্রতারণা না থাকা। মালিকানা অর্জিত হওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা আছে, এমন কোনো লেনদেন না করা। এককথায় যার পরিণাম অনিশ্চিত। জাহালত বলতে বোঝায় যে বস্তুর বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি ইত্যাদি জানা যায় না।

উপমহাদেশের বড় বড় দারুল ইফতা থেকেও শর্ত সাপেক্ষে ই-বাণিজ্য বৈধতার ফাতাওয়া প্রদান করা হয়েছে। যেমনটা জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ইউসুফ বিন্নুরী টাউনের এক ফাতাওয়ায় বর্ণনা করা হয়,

آن لائن کاروبار میں اگر مبیع (جو چیز فروخت کی جاری ہو) بیچنے والے کی ملکیت میں نہیں ہے اور وہ محض اشتہار، تصویر دکھلا کر کسی پر وہ سامان فروخت کرتا ہے اور بعد میں وہ سامان دکان، اسٹور وغیرہ سے خرید کر دیتا ہے تو یہ صورت جائز نہیں؛ اس لیے کہ بائع کی ملکیت میں مبیع موجود نہیں ہے اور وہ غیر کی ملکیت میں موجود سامان کو فروخت کر رہا ہے۔

اس کے جواز کی صورت یہ ہوسکتی ہے کہ بائع مشتری کو یہ کہہ دے کہ یہ سامان میری ملکیت

العصر.

অর্থাৎ শরীয়তে হারাম করা হয়নি, এমন বিষয় ছাড়া লেনদেনের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো বৈধতা। আল্লামা সুয়ূতী আল আশবাহ ওয়ান নাযাইর গ্রন্থে বলেন, 'শরয়ী দলিলে যতক্ষণ না কোনো কিছু হারাম করা হচ্ছে, ততক্ষণ সব কিছুর মূলনীতি হলো বৈধতা।' তাই ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্পাদিত এই লেনদেন যদি শরয়ী পদ্ধতিতে করা হয় এবং তাতে কোনোরূপ অনিশ্চয়তা, অজ্ঞতা বা প্রতারণা না থাকে, তবে সেটা শরয়ীভাবে বৈধ; এতে কোনো দোষ নেই। এর কারণ হলো, বর্তমান যুগে মানুষের এ ধরনের লেনদেনের প্রয়োজন রয়েছে।

জর্ডানের সরকারি ফাতাওয়াদানের ওয়েবসাইটে অনলাইনে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ বলে মত দেওয়া হয়েছে।

الأصل الشرعي إباحة البيوع سواء تمت على أرض الواقع أو عن طريق الإنترنت بشرط خلوها عن المحظورات الشرعية قال الله تعالى وأحل الله البيع.

শরীয়তের মূলনীতি হলো ক্রয়-বিক্রয় বৈধ, চাই সেটা বাস্তবিকভাবে সশরীরে সম্পাদিত হোক অথবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে হোক। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো, এই ক্রয়-বিক্রয় শরীয়তে নিষিদ্ধ বিষয় থেকে মুক্ত হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন।'

সৌদি আরবের আল লাজনাতুদ দাইমা লিল ইফতার সদস্য শায়েখ সালিহ আল ফাওযানকে একটি লাইভ অনুষ্ঠানে অনলাইনে ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি উত্তরে বলেছিলেন,

الأصل أن البيع يكون في مجلس بين البائع و المشتري ولكن إذا كنت تعرف البائع و تسمع صوته و حصل الإيجاب و القبول عن متعقد و انه من

পারব, যদি আপনি সন্তুষ্ট থাকেন তাহলে আমি উক্ত পণ্য ক্রয় করে নিজের আয়ত্বে নিয়ে আপনাকে বিক্রি করে দেব। অতঃপর বিক্রেতা উক্ত পণ্য ক্রয় করে নিজের আয়ত্বে নিয়ে নিয়মমাফিক চুক্তি করে ক্রেতার নিকট বিক্রি করে দিলে তখন এই পদ্ধতি বৈধ হবে।

এ রকমভাবে ই-বাণিজ্য পরিচালনাকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান গ্রাহক থেকে অর্ডার নেবে এবং কাঙ্ক্ষিত পণ্য অন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সংগ্রহ করে ক্রেতার নিকট সরবরাহ করবে এবং এ কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে নিলে তাও বৈধ।

আর যদি বিক্রয় পণ্য বিক্রেতার মালিকানায় বিদ্যমান থাকে ও ছবি দেখিয়ে ক্রেতার নিকট বিক্রি করে থাকে এবং ক্রেতার কাছ থেকে মূল্য উসূল করে নেওয়া হয় তাহলে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে। তবে বিক্রয় পণ্য ক্রেতার কাছে পৌঁছার পর দেখে যদি তার কাঙ্ক্ষিত চাহিদা অনুযায়ী না হয় তাহলে তা ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকবে।

উপরোক্ত দুই প্রকারেই ক্রেতার যতক্ষণ বিক্রয় পণ্য আয়ত্ত করবে না, সে তা অন্য কারো নিকট বিক্রি করতে পারবে না। (দারুল ইফতা বিন্নূরী টাউন, ফাতাওয়া নাম্বার ১৪৩৮১২২০০০১২)

আল জামেয়াতুল আযহারের অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে অনলাইনে ক্রয়-বিক্রয় নিয়ে নিম্নোক্ত ফাতাওয়া দেওয়া হয়েছে,

الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه قال السيوطي في الأشباه و النظائر الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمه. فإذا كانت هذه المعاملات التي تتم عن طريق الإنترنت تستخدم بطريقة شرعية؛ ولا تشتمل على غرر أو جهالة أو غش فهي جائزة شرعا، ولا حرج في ذلك؛ لحاجة الناس إليها في هذا

میں نہیں، میں اسے خرید کر آپ پر اتنی قیمت میں فروخت کرسکتا ہوں، اگر آپ راضی ہیں تو میں یہ سامان خرید کر اپنے قبضہ میں لے کر آپ کو بیچ دوں گا۔ یوں بائع اس سامان کو خرید کر اپنے قبضہ میں لے کر باقاعدہ سودا کر کے مشتری پر فروخت کرے تو یہ درست ہے۔

اسی طرح آن لائن کام کرنے والا فرد یا کمپنی ایک فرد (مشتری) سے آرڈر لے اور مطلوبہ چیز کسی دوسرے فرد یا کمپنی سے لے کر خریدار تک پہنچائے اور اس عمل کی اجرت مقرر کر کے لے تو یہ بھی جائز ہے۔

اور اگر مبیع بائع کی ملکیت میں موجود ہو اور تصویر دکھلا کر مشتری پر فروخت کی جارہی ہو اور مشتری سے قیمت وصول کرلی جائے تو یہ بیع درست ہے، البتہ جب مبیع مشتری تک پہنچ جائے اور دیکھنے کے بعد اس کی مطلوبہ شرائط کے مطابق نہ ہو تو اسے واپس کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔

ان دونوں صورتوں میں مشتری جب تک مبیع پر قبضہ نہ کرلے وہ آگے کسی اور پر وہ سامان فروخت نہیں کرسکتا۔ فقط واللہ اعلم

অর্থাৎ ই-বাণিজ্যিক লেনদেনে যদি বিক্রয় পণ্য (যে বস্তু বিক্রি করা হচ্ছে) বিক্রেতার মালিকানায় না থাকে ও সে শুধুমাত্র বিজ্ঞপ্তি, ছবি দেখিয়ে কাউকে উক্ত পণ্য বিক্রি করে থাকে এবং পরবর্তিতে উক্ত পণ্য দোকান, শো-রুম ইত্যাদি থেকে ক্রয় করে দিয়ে থাকে তাহলে এই পদ্ধতি অবৈধ। এ জন্য যে, বিক্রেতার মালিকানায় বিক্রয় পণ্য বিদ্যমান নেই এবং সে অন্যের মালিকানাভুক্ত পণ্য বিক্রি করছে। এটার বৈধতার জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে যে বিক্রেতা ক্রেতাকে এ কথা বলে দেবে যে উক্ত পণ্য আমার মালিকানায় নেই, আমি তা ক্রয় করে আপনাকে এ পরিমাণ মূল্যে বিক্রি করতে

و المراد هنا إثبات الفعل الخاص الدال على الرضا الواقع أولا

অর্থাৎ আভিধানিক অর্থে ইজাব হলো, যেকোনো কিছু সাব্যস্ত করার নাম। আর এখানে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন বিশেষ একটি কাজকে সাব্যস্ত করা, যা প্রথমে সন্তুষ্টি পাওয়া যাওয়ার প্রতি প্রমাণ বহন করে। (ফাতহুল কাদীর : ৬/২৪৮)

এটাও জেনে রাখা চাই, ইজাব-কবুলের জন্য মৌখিক উচ্চারণের প্রয়োজন নেই; বরং তা যদি কোনো ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমেও বোঝানো যায়, তাও যথেষ্ট বলে গণ্য হবে।

এ বিষয়টিকে সামনে রেখে আল্লামা মুস্তাফা আযযুরকা (রহ.) "আল মাদখালুল ফিকহীয়ুল আম" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

إن النطق باللسان ليس حتميا لظهور الإرادة العقدية بصورة جازمة فى النظر الفقهى ؛ بل النطق هو الأصل فى البيان و لكن قد تقوم مقامة كل وسيلة اختيارية أو اضطرارية مما يمكن أن يعبر عن الإرادة الجازمة تعبيرا كاملا مفيدا، و على هذا فقد رأى الفقهاء أنه يقوم مقام النطق فى الإيجاب و القبول إحدى وسائل ثلاث أخرى، و هى : الكتابة، و الإشارة من الأخرس، و التعاطى.

অর্থাৎ নিঃসন্দেহে মৌখিক উচ্চারণ চুক্তির ইচছা প্রকাশের ক্ষেত্রে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে আবশ্যকীয় বিষয় নয়। বরং মৌখিক কথা হলো প্রকাশের মূল মাধ্যম; তবে কখনো যেকোনো ঐচ্ছিক ও জরুরি মাধ্যমও এর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে, যা সুনির্দিষ্ট ইচ্ছার প্রতি পরিপূর্ণ প্রতিফলন ঘটায়। এরই ভিত্তিতে ফুকাহায়ে কেরাম মত ব্যক্ত করেছেন যে ইজাব-কবুলের ক্ষেত্রে মৌখিক কথার স্থলাভিষিক্ত তিনটি বিষয়ের যে কোনো একটি হতে পারে। তা হলো ১। লেখনী, ২। বোবা ব্যক্তির ইশারা ও ৩। বাস্তবে নয়। ফলে বাস্তবিক এমন কিছুর প্রয়োজন, যার দ্বারা এ সম্পর্কে জানা যাবে। এ কারণেই প্রজ্ঞাময় মহান রাব্বুল আলামীন এমন কিছু লক্ষণ রেখেছেন, যা সন্তুষ্টির অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে। আর ওই সব লক্ষণই চুক্তির মূলভিত্তি এবং তা কথা, কাজ বা লেখনী যার মাধ্যমেই সন্তুষ্টি বোঝা যায় হতে পারে।

এখানে প্রথমে এটা জেনে নেওয়া আবশ্যক যে ইজাব-কবুল দ্বারা এর মূল উদ্দেশ্য কী? এ বিষয়ে হযরত ফুকাহায়ে কেরাম যা লিখেছেন তা হলো এই, ক্রেতা-বিক্রেতা কোনো পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়সংক্রান্ত যা কথাবার্তা বলে থাকে তাই মূলত ইজাব-কবুল। এ বিষয়ে ইমাম মালেক, শাফেয়ী এবং আহমদ (রহ.)-এর মতামত হলো, ইজাব বলা হয় ওই কথাকে, যা বিক্রেতার পক্ষ থেকে প্রকাশ পায় এবং কবুল বলা হয় যা ক্রেতার পক্ষ থেকে উক্ত প্রস্তাবের প্রতিউত্তরে প্রকাশ পায়। অন্যদিকে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মত হলো, ইজাব যেকোনো এক পক্ষের প্রস্তাবকে বোঝায়, যা চুক্তিসংক্রান্ত সন্তুষ্টির ওপর প্রমাণ বহন করে, চাই তা বিক্রেতার পক্ষ থেকে হোক কিংবা ক্রেতার পক্ষ থেকে হোক।

মোটকথা, ইজাব-কবুল তা এমন একটি মাধ্যম, যার দ্বারা কোনো লেনদেনের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সন্তুষ্টির প্রতি প্রমাণ বহন করে থাকে।

বিজ্ঞ ফুকাহায়ে কেরাম এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, ইজাব-কবুলের জন্য কোনো নির্ধারিত পদ্ধতি নেই। বরং যার দ্বারাই উভয় পক্ষের সন্তুষ্টি প্রতীয়মান হবে মূলত তাই ইজাব-কবুল হিসেবে গণ্য হবে। (আল মাওসূআতুল ফিকহিয়া : ৩০/২০০)

আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহ.) "ফাতহুল কাদীর" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

الايجاب لغة :الإثبات لأى شيء كان، و المراد هنا إثبات الفعل الخاص الدال على الرضا الواقع أولا

تعرفه فقد يعقد البيع و هذا مجلس حكمى.

মূলনীতি হলো ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে একটি মজলিসে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হওয়া। তাই আপনি যখন ক্রেতাকে চিনবেন, তার কথা শুনবেন এবং ইজাব ও আপনার পরিচিতজন থেকে কবুল পাওয়া যাবে, তখন ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি সম্পন্ন হবে। আর এ মজলিসটি হুকুমগত দিক থেকে একটি 'মজলিস' হিসেবে গণ্য হবে। (ইসলামী আইন ও বিচার, সংখ্যা ৫৫, পৃ. ১৭-১৮)

সুতরাং বর্ণিত নীতিমালা এবং ফাতাওয়াসমূহের ভিত্তিতে বলা যায়, ই-বাণিজ্য এমন একটি লেনদেন, যার দিকে মানবসমাজ তাদের জীবন-জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে অনেক বেশি মুখাপেক্ষী এবং কেউ এর বিরোধিতা করেননি অথবা এ থেকে নিষেধও করেননি। ফলে তা বৈধ হবে সব ধরনের উপকারী বস্তুর ক্ষেত্রে বৈধতার বিধান অনুযায়ী।

ই-বাণিজ্যের বিধি-বিধান :

ই-বাণিজ্য সাধারণ অন্যান্য বাণিজ্যচুক্তির মতোই। ফলে এর জন্যও রয়েছে রুকন ও শর্তাদি। আর তাই এ পর্যায়ে ই-বাণিজ্যের রুকন ও শর্তাবলি নিয়ে আলোচনা করা হবে।

ই-বাণিজ্যের রুকন :

১. চুক্তির ক্ষেত্রে দু পক্ষের উপস্থিতি। প্রথম পক্ষ হলো যে সরাসরি বা প্রতিনিধি হিসেবে পণ্যে হস্তক্ষেপ করার ক্ষেত্রে অনুমতিপ্রাপ্ত। এভাবে যে সে পণ্য ও এর গুণাবলি উল্লেখপূর্বক তা নির্দিষ্ট পেজে উপস্থাপন করেছে, উক্ত পণ্যের কাঙ্ক্ষিত দর উল্লেখ করে। দ্বিতীয় পক্ষ হলো যে উক্ত পণ্যের মালিকানা নিতে আগ্রহী।

২. ইজাব-কবুল পাওয়া যাওয়া। সব ধরনের চুক্তি বাস্তবায়নের মূলভিত্তি হলো উভয় পক্ষের সন্তুষ্টি। এটা এমন এক মৌন বিষয়, যার ওপর জ্ঞাত হওয়া সম্ভব

লেনদেন। অর্থাৎ পণ্য ও মূল্যের আদান প্রদান। (আল মাদখালুল ফিকহীয়ুল আম : ১/৪১১)

সুতরাং একটা ই-বাণিজ্যিক চুক্তিতে ইজাব-কবুল বিভিন্নভাবে হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ :

১. মালিকের পক্ষ থেকে পণ্যটার গুণাবলি এবং নির্ধারিত মূল্য সহকারে উপস্থাপন করা। আর এটাই ইজাব বা প্রস্তাব হিসেবে গণ্য হবে।

২. ক্রেতা ইন্টারনেটের সাহায্যে কোনো বাণিজ্যিক ওয়েবসাইটে ঘোরাঘুরি করে, একটি বিশেষ পণ্য সম্পর্কে যাচাই-বাছাই করে। তাতে পণ্যের ক্যাটালগ দেখে এবং মূল্য পরিশোধ প্রক্রিয়া ও পণ্য হস্তান্তর পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করে থাকে। অতঃপর নির্দিষ্ট পণ্যের মালিকানা হস্তান্তরের বিশেষ একটি ফরম পূরণের মাধ্যমে তা সম্পন্ন হয়ে থাকে। সুতরাং এসব কার্যাদি কবুল বা প্রস্তাব গ্রহণ হিসেবে গণ্য হবে এবং এর মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদিত হয়ে যাবে।

৩. বিনিময়সমূহ বুঝে পাওয়া। তা হলো মূল্য ও পণ্য। ফলে বিক্রেতা মূল্য এবং ক্রেতা পণ্য নিতে বাধ্য থাকবে।

মূল্য হলো, যা বিক্রীত পণ্যের বিনিময়ে হয়ে থাকে এবং যা দায়িত্বে নির্ধারিত হয়ে যায়। আর তা হয়ে থাকে উভয় পক্ষের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে। চাই তা বাজারদরের বেশি, কম বা সমান হোক। আর পণ্য হলো, যা ক্রেতা মূল্যের বিনিময়ে গ্রহণ করে থাকে। সুতরাং পণ্য বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন–কোনো বস্তু ও সেবা।

ই-বাণিজ্যের শর্তাবলি

১. চুক্তি সম্পাদনকারী উভয় পক্ষের শর্তাবলি :

১. উপযুক্ত হওয়া। এভাবে যে চুক্তিকারী উভয় পক্ষেরই হস্তক্ষেপ করার বৈধতা থাকা। অর্থাৎ বোধশক্তিসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। সুতরাং পাগল, মাতাল ও বোধশক্তিসম্পন্নহীন অপ্রাপ্তবয়স্ক কেউ হতে পারবে না। ফলে কোনো পাগল যদি ই-বাণিজ্যিক লেনদেন করে তাহলে উক্ত চুক্তি বাতিল হিসেবে গণ্য হবে, আর এ কারণেই চুক্তিকারী পক্ষদ্বয়ের আবশ্যক যোগ্যতা সম্পর্কে ভালোভাবে যাচাই-বাছাই করে নেওয়া।

২. কর্তৃত্ব থাকা। এবং তা হয়ে থাকে মালিক বা মালিকের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হওয়ার মাধ্যমে। ফলে যদি কোনো বাহিরের কেউ ইন্টারনেটের ওয়েব পেজে পণ্য উপস্থাপন করে অন্য কারো জন্য, অতঃপর কেউ যদি তা ক্রয় করে নেয় তাহলে উক্ত চুক্তি আসল মালিকের অনুমতির ওপর স্থগিত হিসেবে গণ্য হবে।

৩. সন্তুষ্টি পাওয়া। আর এটাই হলো মূল জিনিস, যার ওপর চুক্তিসমূহের ভিত্তি। কেননা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন, " إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " অর্থাৎ আল্লাহ এমন বাণিজ্য হালাল করেছেন, যেখানে উভয় পক্ষের সন্তুষ্টি বিদ্যমান থাকে। ফলে ইন্টারনেটে উপস্থাপনকৃত কোনো পণ্য ক্রয়ের ওপর কাউকে বাধ্য করা হলে সমস্ত ফুকাহায়ে কেরামের ঐকমত্যে সন্তুষ্টি না পাওয়ার কারণে তার ক্রয়ে চুক্তি সংঘটিত হবে না।

৪. একের অধিক পক্ষ হওয়া। এভাবে যে চুক্তিটা দুই পক্ষে বাস্তবায়ন করা, কেননা একটা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি শুধুমাত্র একটা পক্ষের মাধ্যমে বৈধ হয় না। ফলে কেউ যদি অন্য কোনো ব্যক্তিকে তার জন্য গাড়ি ক্রয় করার প্রতিনিধি বানায় এবং সে যদি তার পক্ষ থেকে ইন্টারনেটে উপস্থাপিত গাড়ি তার মক্কেলের জন্য ক্রয় করে নেয় তাহলে উক্ত লেনদেন বৈধ হবে না।

২. ইজাব-কবুলের শর্তাবলি :

১. চুক্তি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। এভাবে যে ইজাব-কবুলের মাধ্যমে চুক্তিকারী পক্ষদ্বয়ের উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাওয়া, চাই তা শোনার মাধ্যমে জানা যাক বা পড়ার মাধ্যমে জানা যাক। এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো শব্দ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি।

২. কবুলটা ইজাবের অনুরূপ হওয়া। কেননা চুক্তি হলো উভয় পক্ষের ইচ্ছাতে মিল থাকা। সুতরাং এর জন্য প্রস্তাব প্রদানকারীর পণ্য ও এর মূল্যের ক্ষেত্রে প্রতিটি বিষয়ে প্রস্তাবগ্রহীতার মিল থাকা আবশ্যক। ফলে কোনো বিক্রেতা যদি পণ্যের জন্য পঞ্চাশ টাকায় রাজি হয় এবং ক্রেতা তা যদি চল্লিশ টাকায় কবুল করে নেয় তাহলে উক্ত চুক্তি সম্পাদিত হবে না। কারণ এখানে কবুলটা ইজাবের অনুরূপ হয়নি।

৩. ইজাব ও কবুল কোনো শর্ত বা ভবিষ্যতের কোনো সময়ের সাথে সম্পৃক্ত না হওয়া।

৪. কবুলটা ইজাবের সাথে মিলিত হওয়া। অর্থাৎ ইজাব ও কবুলের মাঝে এমন বিভক্তি থাকতে পারবে না, যার কারণে প্রস্তাব গ্রহণ থেকে বিমুখতা প্রকাশ পায়। এবং চুক্তির মজলিস বা বৈঠক এক হওয়া। আর মজলিস দ্বারা ওই অবস্থা উদ্দেশ্য, যাতে উভয় পক্ষ চুক্তির বিষয়ে মগ্ন থাকে।

৩. চুক্তির ক্ষেত্রসমূহের শর্তাবলি :

১. মূল্যমান বস্তু হওয়া। আর এ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যা মালিকানায় আছে এবং সর্বাবস্থায় তা থেকে উপকৃত হওয়ার সম্ভাব্যতা থাকা।

২. বস্তুটা দ্বারা উপকৃত হতে পারা। এমন উপকার, যা শরয়ীভাবে বৈধ। এবং যা কোনো উপকারেই আসে না, তা বিক্রয় করা অবৈধ; যেমন–পোকা ও পিঁপড়া, আর সব ধরনের ঘৃণ্য কীটপতঙ্গ, যেমনটা হারাম উপকারের বিক্রয় নিষিদ্ধ। যেমন–মদ, শুয়ার ইত্যাদি।

অতএব কেউ যদি ই-বাণিজ্যের মাধ্যমে

মদের চুক্তি সম্পাদন করে তাহলে উক্ত চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩. হস্তান্তরের সামর্থ্য থাকা। এমনভাবে যে বিক্রেতা বিক্রীত বস্তু হস্তান্তর করতে সক্ষম হওয়া। কেননা হস্তান্তরের অপরাগতা ঝগড়ার দিকে নিয়ে যায়। আর এ দ্বারা অপর পক্ষ ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এর ওপর ভিত্তি করে চুরি করা গাড়ি এবং অপরের মালিকানাভুক্ত বস্তু বিক্রয় করা বৈধ নয়, যা বিক্রেতা হস্তান্তর করতে অপারগ।

৪. চুক্তির ক্ষেত্র সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। তা দেখা বা ইশারার মাধ্যমে হয়ে যেতে পারে। আর বস্তু চুক্তির বৈঠকে বিদ্যমান না থাকলে তখন এর গুণাবলি জানার উপায় থাকা। ফলে গুণাবলির ওপর ভিত্তি করে ই-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। আর তা ক্যাটালগের মাধ্যমে হবে, যেখানে উৎপাদিত পণ্যের সব ধরনের তথ্য উল্লেখ থাকে এবং সেখানে হস্তান্তর ও মূল্য পরিশোধসংক্রান্ত যাবতীয় বর্ণনা দেওয়া থাকে। (আত তিজারাহ আল ইলিকত্রনিয়াহ ফিল ফিকহিল ইসলামী, পৃ. ৪৫-৫৫)

ই-বাণিজ্যের মাধ্যমসমূহ :

ইলেকট্রনিক মাধ্যমসমূহ ই-বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। এ প্রসঙ্গে আহমদ খালিদ আল আজলুনী বলেছেন, 'এ ধরনের চুক্তি ফ্যাক্স অথবা ই-মেইল নয়তো ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।' প্রযুক্তির দুনিয়ায় প্রতিদিনই নতুন নতুন আবিষ্কার যোগ হচেছ। যোগাযোগব্যবস্থাতেও প্রতিনিয়ত পরিবর্তন আসছে। এ জন্য ই-বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের জন্য নানা ধরনের আধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ছে। বর্তমান সময় পর্যন্ত যেসব যন্ত্র দিয়ে সিংহভাগ ই-বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, সেগুলোর তালিকা নিম্নরূপ :

১. মিনিটেল (Minitel)
২. টেলেক্স (Telex)
৩. ফ্যাক্স (Fax)
৪. পেজার (Pager)
৫. ভিডিও ফোন (Smart phone)
৭. ইন্টারনেট (Internet)

ই-বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের পদ্ধতি :

এ বিষয়ে আমরা সকলেই জানি যে বর্তমান সময়ে ইন্টারনেটের উন্নতি এবং ব্যাপকতার ফলে সব ধরনের কাজই এর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে লেনদেনপ্রক্রিয়াও বর্তমানে অনেকাংশে ইন্টারনেটনির্ভর।

উক্ত পারস্পরিক লেনদেনের প্রধানত দুটি ধরন রয়েছে। একটি হলো, ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি। আরেকটি হলো, ইজারা চুক্তি, যেখানে বিভিন্ন প্রকারের সেবা প্রদান করা হয়। যেমনিভাবে ইন্টারনেটের সাহায্যে বিভিন্ন প্রকারের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নিজের পছন্দনীয় যেকোনো ধরনের জিনিস ক্রয়-বিক্রয় করা যায়, ঠিক তেমনি কোনো কারণে কোনো সেবা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তাও ইন্টারনেটের সাহায্যে নির্ধারিত ওয়েবসাইটে গিয়ে নেওয়া যায়। বর্ণিত অধ্যায়ে কোনো ই-বাণিজ্যিক চুক্তি কিভাবে সম্পাদন হয়ে থাকে তা নিয়ে আলোচনা করা হবে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্পাদিত এসব চুক্তি সাধারণত দুই স্তরের হয়ে থাকে :

১. ক্রয়ের স্তর।
২. বিক্রয়ের স্তর।

প্রথমত, ক্রয়ের স্তর :

একটি অনলাইন ক্রয় চুক্তি নিম্নে বর্ণিত কয়েকটি ধাপের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়ে থাকে :

১. কোনো ক্রেতা তার ইন্টারনেট উপযোগী যন্ত্রে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপনের পর কোম্পানির নির্দিষ্ট বাণিজ্যিক ওয়েব পেজে প্রবেশ করা, পণ্য নির্বাচন করা, কাঙ্ক্ষিত সংখ্যা নির্ধারণ করা এবং তালিকা ফরম পূরণ করা।

২. প্রদত্ত পণ্য পরিবহন মাধ্যম সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া, পণ্য পরিবহনের জন্য উক্ত মাধ্যমগুলো থেকে একটি মাধ্যম নির্বাচন করা এবং পণ্য পরিবহন ফরম পূরণ করা। যেমন–ক্রেতার নাম ও ঠিকানা দেওয়া, অর্থাৎ তার বাসস্থানের বর্ণনা দেওয়া, যেখানে পণ্য হস্তান্তরপ্রক্রিয়া সমাপ্ত হবে।

৩. ক্রেতা তার কাঙ্ক্ষিত দ্রব্য ও এর মূল্যের সংক্ষিপ্ত ডকুমেন্ট অর্জন করা, যাতে সে সত্যায়িত করবে এবং বর্ণিত তথ্যাদির নির্ভুলতার নিশ্চিয়তা প্রদান করবে।

৪. ক্রেতা মূল্য পরিশোধের স্তরে যাওয়া, এটা ই-বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের এমন একটি অংশ, যা ডকুমেন্ট চুরি/হ্যাক হওয়া থেকে রক্ষণাবেক্ষণ ও চুক্তির নিরাপত্তার দায়ভারের জন্য কোম্পানির সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রামের মাধ্যমে সংরক্ষিত থাকে। অতঃপর ক্রেতা কার্ডের ডিজিট পূরণ করা, তারপর কার্ড থেকে পণ্যের মূল্য পরিশোধের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে ক্লিক করার সাথে সাথেই একটি ডকুমেন্ট সংকেত আকারে মধ্যস্থতাকারী ব্যাংকের কাছে চলে যাবে, যা যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে কার্ডের উপযোগিতা প্রমাণিত হয় এবং পণ্যের মূল্য পরিশোধের জন্য উক্ত রসিদ যথেষ্ট হয়। বর্তমানে মূল্য পরিশোধের জন্য কার্ডের পাশাপাশি মোবাইল ব্যাংকিং সেবা ও ক্যাশঅন ডেলিভারি, যেখানে পণ্য হাতে পাওয়ার পর মূল্য পরিশোধ করার পদ্ধতিও চালু রয়েছে।

৫. অতঃপর পণ্য হস্তান্তরের পালা। যদি তা কোনো ডকুমেন্ট বা ছবি হয়ে থাকে তাহলে এর হস্তান্তরপ্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়ে থাকে সরাসরি কম্পিউটারের মাধ্যমে। আর যদি তা কোনো পণ্যদ্রব্য হয়ে থাকে তাহলে তা হস্তগত হওয়ার সময়সীমা পণ্য

পরিবহন মাধ্যম ও হস্তান্তরের স্থান হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, বিক্রয়ের স্তর :

নিম্নে বর্ণিত কার্যপ্রণালির মাধ্যমে ইন্টারনেট দ্বারা বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হয়ে থাকে :

১. ওয়েব পেজে কার্যক্রম পরিচালনা, ক্রয় অর্ডার পাওয়া, পণ্যের মূল্যসংক্রান্ত আলোচনা, হস্তান্তরের স্থান এবং পণ্য পরিবহন মাধ্যমের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের অনুসরণ করা, যার নির্ধারণ কোম্পানির পক্ষ থেকে হয়ে থাকে।

২. অর্ডার এবং এর মূল্যসংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত ডকুমেন্ট ক্রেতার নিকট প্রেরণ করা, যেন তা দ্বারা ডকুমেন্টের নির্ভুলতা যাচাই করা যায়।

৩. কার্ডসংশ্লিষ্ট মধ্যস্থতাকারী ব্যাংকের বার্তার অপেক্ষা করা, যেখানে মধ্যস্থতাকারী ব্যাংক বিক্রেতার ব্যাংকের কাছে ডকুমেন্ট প্রেরণ করে থাকে, যা দ্বারা কার্ডের উপযোগিতা এবং অর্ডারকৃত পণ্যের মূল্য তা দ্বারা আদায় করা যাবে কি না, তা যাচাই করা হয়। এর বৈধতা পাওয়ার পর উক্ত লেনদেন সমাপ্ত হয়ে থাকে। আর যদি মূল্য পরিশোধ মোবাইল ব্যাংকিং বা ক্যাশঅন ডেলিভারি পদ্ধতিতে হয়ে থাকে তাহলে তাতে এসব ঝামেলা থাকে না।

৪. কোম্পানির নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট অ্যাকাউন্টিং ও প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পাদন এবং পণ্য পরিবহন সেবার মাধ্যমে ক্রেতার ঠিকানায় অর্ডার প্রেরণের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য অর্ডারের অনুমোদন প্রেরণ করা।

ই-বাণিজ্যবিষয়ক আন্তর্জাতিক ফিকহ একাডেমির সিদ্ধান্ত :

বিগত ১৭ থেকে ২৩ শাবান ১৪১০ হিজরী মোতাবেক ১৪ থেকে ২০ মার্চ ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ফিকহ একাডেমির বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে ইন্টারনেট, ফ্যাক্স এবং কম্পিউটারের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত চুক্তিসমূহ ইজাব-কবুল প্রেরণের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে যাবে। আর ফোন এবং বেতারের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত চুক্তির ক্ষেত্রে শর্ত হলো ইজাব-কবুলের পারস্পরিক সামঞ্জস্যতা থাকতে হবে।

আন্তর্জাতিক ফিকহ একাডেমির সিদ্ধান্তসমূহ :

১. যখন দুজন অনুপস্থিত পক্ষের মাঝে চুক্তি সম্পন্ন হয়ে থাকে, যারা এক জায়গায় একত্রিত নয়, সরাসরি একে অন্যকে দেখেও না, একে অন্যের কথাও শুনতে পায় না এবং উভয়ের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম পত্র, ই-মেইল বা বাহক হয়ে থাকে, আর ইন্টারনেট, টেলেক্স, ফ্যাক্স ও কম্পিউটারের মনিটরের ক্ষেত্রে উক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে। এমতাবস্থায় চুক্তি প্রাপকের নিকট ইজাব পৌঁছার পর তার কবুলের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে যাবে।

২. যখন দুই পক্ষের মাঝে একই সময়ে চুক্তি সম্পন্ন হয়ে থাকে অথচ দুজন দুই দূরত্বে বিদ্যমান এবং এটা হয়ে থাকে ফোন ও বেতারের মাধ্যমে, এমতাবস্থায় উভয় পক্ষের মাঝে সম্পাদিত চুক্তিটা উপস্থিত দুই পক্ষের চুক্তি হিসেবে গণ্য হবে এবং এতে ফুকাহায়ে কেরামের পক্ষ থেকে নির্ধারিত মৌলিক নীতিমালাসমূহ প্রযোজ্য হবে।

৩. যখন উল্লিখিত মাধ্যমসমূহের সাহায্যে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রস্তাব প্রদান করা হয় তা উক্ত সময়ের সমাপ্তি পর্যন্ত আবশ্যক হিসেবে গণ্য হবে, এবং প্রস্তাব প্রদানকারী তা ফিরিয়ে নিতে পারবে না।

৪. উল্লিখিত নীতিমালাসমূহ বিবাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। কেননা এতে সাক্ষ্যের শর্তারোপ করা হয়েছে, সরফ চুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। কেননা এতে উভয় পক্ষের কবজার শর্তারোপ করা হয়েছে এবং সলম চুক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে না। কেননা এতে মূলধন অগ্রিম পরিশোধের শর্তারোপ করা হয়েছে।

৫. যেখানে জাল, নকল বা ভুলের সম্ভাবনা রয়েছে, সেখানে তা প্রমাণের জন্য সাধারণ নীতিমালা গ্রহণ করা হবে। (মাজাল্লাতু মাজমায়িল ফিকহিল ইসলামী, সংখ্যা-৬, খণ্ড-২, পৃ. ১২৬৭-১২৬৮)

ই-বাণিজ্যের ওপর AAOIFI কর্তৃক প্রণীত শরয়ী মানদণ্ড :

ইন্টারনেটের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন

ভূমিকা

বর্ণিত মানদণ্ডে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্পাদিত চুক্তি এবং আর্থিক লেনদেন সম্পর্কীয় শরয়ী বিধি-বিধান বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। সাথে সাথে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ ধরনের চুক্তি এবং লেনদেনে যা লক্ষ রাখা আবশ্যক, তাও বর্ণনা করা। 'আল্লাহই তাওফিক দাতা'

মানদণ্ডের বিবরণ :

১. মানদণ্ডের পরিধি :

বর্ণিত মানদণ্ডে অন্তর্ভুক্ত থাকবে ইন্টারনেটের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সম্পাদিত আর্থিক চুক্তির শরয়ী বিধি-বিধানের বর্ণনা, চাই তা ব্যবসায়িক কোনো ওয়েবসাইট তৈরি করার ব্যাপারে হোক বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগের সেবা প্রদান করার ব্যাপারে হোক এবং এগুলোর মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদন করার শরয়ী অভিযোজনের বর্ণনা এবং উক্ত পদ্ধতিতে চুক্তি সম্পাদনের সময়সীমা নির্ধারণ, এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্পাদিত চুক্তির কবজাবিষয়ক বিধি-বিধানের বর্ণনা, পাশাপাশি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সম্পাদিত আর্থিক লেনদেনের সংরক্ষণবিষয়ক শরয়ী নীতিমালার বর্ণনা।

২. ইন্টারনেটে ব্যবসায়িক ওয়েবসাইট তৈরীকরণ এবং এর মাধ্যমে আর্থিক চুক্তি

সম্পাদন :

২/১ ইন্টারনেটে ব্যবসায়িক ওয়েবসাইট তৈরি করা বৈধ তবে শর্ত হলো তা শরয়ীভাবে হারাম, এমন কিছু থেকে মুক্ত হতে হবে, যেমন অবৈধ পণ্য, সেবা বা কর্মকাণ্ড, অথবা বৈধ পণ্য, সেবা বা কর্মকাণ্ডের প্রচারের জন্য কোনো অবৈধ উপকরণ বা মাধ্যম গ্রহণ করা।

২/২ ইন্টারনেটের মাধ্যমে আর্থিক চুক্তি সম্পাদন করা বৈধ, ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষ থেকে গ্রাহকদের সাথে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্পাদিত চুক্তিসমূহ ইসলামী শরীয়তে আর্থিক লেনদেনের জন্য প্রণীত সাধারণ নীতিমালাসমূহের অনুগামী হবে, যেমন অ্যাকাউন্ট খোলা, হস্তান্তরপ্রক্রিয়া পরিচালনা করা বা ব্যবসায়িক চুক্তিসমূহ ইত্যাদি।

৩. ইন্টারনেটে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যোগাযোগ সেবা প্রদান :

৩/১ ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য গ্রাহকদের স্বার্থে যৌথ চুক্তিসমূহের ক্ষেত্রে বা এমন অন্য কোনো ক্ষেত্রে নির্ধারিত বিনিময়ের ভিত্তিতে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যোগাযোগের সেবা প্রদান করা বৈধ।

৩/২ ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যোগাযোগের সেবা প্রদানের চুক্তির শরয়ী অভিযোজন নিশ্চয় তা একটি প্রতিষ্ঠান এবং এর সেবা গ্রহণকারী গ্রাহকদের মধ্যে যৌথ ইজারা চুক্তি। এই ভিত্তিতে তা সাধারণ ইজারা চুক্তি এবং বিশেষত যৌথ শ্রমিকের সাথে ইজারা চুক্তির নীতিমালা ও শর্তাদির অনুগামী হবে।

৩/৩ উক্ত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের জন্য সেবা গ্রহণকারীদের পক্ষ থেকে ওয়েবসাইটের জন্য পরিপূর্ণ সতর্কতা এবং সম্ভাব্য প্রতিরোধ গড়ে তোলা আবশ্যক, যা শরীয়ত পরিপন্থী মাধ্যম ব্যতিরেকে হবে।

৪. ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্পাদিত আর্থিক চুক্তিসমূহের ক্ষেত্রে চুক্তি বৈঠক :

৪/১ ইন্টারনেটের মাধ্যমে দুই পক্ষের মাঝে অডিও বা ভিডিও কলের সাহায্যে চুক্তি সম্পাদিত করাটা উপস্থিত দুই পক্ষের চুক্তির বিধানের আলোকে হবে। ফলে এর ওপর ভিত্তি করে উপস্থিত দুই পক্ষের চুক্তি সম্পাদনের যাবতীয় বিধান এখানেও প্রয়োগ হবে। যেমন বৈঠক এক হওয়ার শর্তারোপ, দুই পক্ষের যেকোনো এক পক্ষ হতে চুক্তি থেকে এড়িয়ে যাওয়া ওপর কোনো কিছু প্রকাশ না পাওয়া, সমাজের প্রচলন অনুপাতে ইজাব-কবুলের মাঝে মিল থাকা এবং এ ধরনের আরো যা বিধান রয়েছে।

৪/১/১ এমতাবস্থায় চুক্তির বৈঠক হলো দুই পক্ষের মাঝে যোগাযোগ স্থাপনের সময়সীমা পর্যন্ত, যতক্ষণ উভয়ের মাঝে চুক্তিবিষয়ক কথাবার্তা বিদ্যমান থাকে। সুতরাং যখন যোগাযোগ শেষ হয়ে যাবে বা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে অথবা উভয় পক্ষ অন্য কোন বিষয়ের দিকে চলে যাবে, যার সাথে চুক্তির কোনো সম্পর্ক নেই তাহলে চুক্তি বৈঠকের সমাপ্তি গণ্য করা হবে। তবে সমাজের প্রচলন অনুপাতে সামান্য সময়ের বিচ্ছিন্নতার দরুন কোনো সমস্যা হবে না।

৪/২ ওয়েবসাইটের পেজ, ফ্যাক্স বা ই-মেইলের সাহায্যে চুক্তি সম্পাদন করাটা অনুপস্থিত দুই পক্ষের চুক্তির বিধানের আলোকে হবে। যেমন–পত্রের মাধ্যমে চুক্তি করা।

৪/২/১ এমতাবস্থায় চুক্তির বৈঠক শুরু হবে প্রাপকের কাছে প্রস্তাবনামা পৌঁছার মুহূর্ত থেকে এবং এর পরিসমাপ্তি হবে প্রস্তাব গ্রহণ করার মাধ্যমে, যেমন প্রস্তাবকারী অপর পক্ষের প্রস্তাব গ্রহণ করার পূর্বে নিজের প্রস্তাব থেকে ফিরে আসার দরুনও বৈঠকের পরিসমাপ্তি ঘটে।

৪/২/২ যখন প্রস্তাবকারী প্রস্তাব গ্রহণের জন্য সময় নির্ধারণ করে দেয়, তখন প্রস্তাব বিদ্যমান থাকবে নির্ধারিত সময়সীমার পরিসমাপ্তি পর্যন্ত এবং প্রস্তাবকারীর নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রস্তাব ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার থাকবে না।

৪/৩ ইন্টারনেটের মাধ্যমে নিলাম চুক্তি সম্পাদনের সময় যে পক্ষ পণ্যের দরের ক্ষেত্রে অধিক মূল্য হাঁকাবে তার জন্য নিলামের পরিসমাপ্তি পর্যন্ত নিজের প্রস্তাব থেকে ফিরে আসার অধিকার থাকবে না, যেমনিভাবে ক্রেতার পক্ষ থেকে নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত আবশ্যকের শর্তারোপ করা অবস্থায় বা সমাজের প্রচলন অনুপাতে বৈঠকের পরিসমাপ্তির পরও নির্ধারিত সময় পর্যন্ত আবশ্যক বিবেচনা করা অবস্থায় নিলামের পরিসমাপ্তির পরও প্রস্তাবকারীর নিজের প্রস্তাব থেকে ফিরে আসার অধিকার থাকে না।

৫. ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্পাদিত আর্থিক চুক্তিসমূহের ক্ষেত্রে ইজাব-কবুলের প্রকাশরীতি :

৫/১ ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্পাদিত চুক্তিসমূহের ক্ষেত্রে ইজাব-কবুল প্রকাশটা চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে দুই পক্ষের সন্তুষ্টি বোঝায়, এমন প্রতিটি বিষয়ের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করবে।

৫/২ যখন ওয়েব পেজ বা ফ্যাক্সের মাধ্যমে এমন বৈদ্যুতিক বার্তা প্রেরণ করা হবে, যা সুদৃঢ় স্থিরকৃত চুক্তিবিষয়ক হবে এভাবে যে তা সব ধরনের দায়-দায়িত্ব ও অধিকারসমূহ অন্তর্ভুক্ত করবে এবং অপর পক্ষ থেকে প্রস্তাব গ্রহণের পর বার্তা প্রেরণকারীর জন্য চুক্তি রহিত করার অধিকার থাকবে না, তখন উক্ত বার্তাটি ইজাব হিসেবে গণ্য হবে।

৫/৩ যখন ওয়েব পেজ বা ফ্যাক্সের মাধ্যমে এমন বৈদ্যুতিক বার্তা প্রেরণ করা হবে, যা সব ধরনের দায়-দায়িত্ব ও অধিকারসমূহের বর্ণনা ব্যতীত কেবল

সুদৃঢ় স্থিরকৃত চুক্তিবিষয়ক হবে, অথবা বার্তা প্রেরণকারী বা প্রকাশকের পক্ষ থেকে ওয়েব পেজে নিজের জন্য চুক্তি রহিত করার অধিকার সংরক্ষণের ওপর শর্তারোপ করে দেয়। যদিও অপর পক্ষ প্রস্তাব গ্রহণ করে ফেলে, তখন উক্ত বার্তাটি চুক্তির জন্য ঘোষণা বা আহ্বান হিসেবে গণ্য হবে এবং তা ইজাব হবে না, ফলে উক্ত চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে পুনরায় ইজাব-কবুল আবশ্যক।

৫/৪ ওয়েব পেজের মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদনের সময় প্রস্তাব গ্রহণের আইকনের ওপর ক্লিক করাটায় শরয়ীসিদ্ধ প্রস্তাব গ্রহণ হিসেবে গণ্য হবে যখন পেজের গঠনে প্রস্তাব গ্রহণের সুদৃঢ় করণের কোনো শর্ত না থাকে। সুতরাং যখন পেজে নির্দিষ্ট যেকোনো পদ্ধতিতে সুদৃঢ়করণের শর্ত থাকে, তখন উক্ত দৃঢ় করণ না হওয়া পর্যন্ত প্রস্তাব গ্রহণ করাটি কার্যকর হবে না।

৫/৪/১ ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য ওয়েব পেজের মাধ্যমে গ্রাহকদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে উচিত সতর্কতামূলক প্রস্তাব গ্রহণের সুদৃঢ়করণের কোনো কার্যপদ্ধতি পেজের গঠনে অন্তর্ভুক্ত রাখা, কেননা অনেক সময় লেনদেনকারীদের পক্ষ থেকে ভুল হয়ে যায়।

৬. ইন্টারনেটের সাহায্যে চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার সময় :

ইন্টারনেটের সাহায্যে চুক্তি সম্পন্ন হবে (চুক্তি যে ধরনেরই হোক না কেন) অপর পক্ষ প্রস্তাব গ্রহণের সাথে সাথেই। চাই প্রস্তাব প্রদানকারী তা জানুক আর না জানুক।

৭. ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্পাদিত আর্থিক চুক্তির ক্ষেত্রে কবজা (হস্তান্তর) :

৭/১ সমাজে প্রচলিত বাস্তবিক বা আইনত কবজার প্রত্যেক পদ্ধতির দ্বারা ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্পাদিত চুক্তির ক্ষেত্রে শরয়ীসিদ্ধ কবজা সাব্যস্ত হবে।

৭/২ যখন ক্রয়কৃত পণ্য কোনো প্রোগ্রাম বা এর মতো অন্য কোনো কিছু হবে তখন চুক্তি সম্পাদনের পর উক্ত প্রোগ্রাম, ডকুমেন্ট বা এজাতীয় কোনো কিছু পেজ থেকে নিজের ব্যক্তিগত কম্পিউটারে ডাউনলোডের মাধ্যমে শরয়ীসিদ্ধ কবজা সাব্যস্ত হবে।

৭/৩ মুদ্রা, স্বর্ণ-রৌপ্য এবং যেখানে উভয় পক্ষের কবজা করা আবশ্যক, এমন কোনো কিছুর ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উভয় বিনিময়ের জন্য চুক্তির বৈঠকেই তৎক্ষণাৎ বাস্তবিক বা আইনত কবজা পাওয়া যাওয়া আবশ্যক।

৮. ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্পাদিত আর্থিক লেনদেনের সংরক্ষণ :

৮/১ ব্যবসায়িক পেজ এবং লেনদেনকারীদের তথ্যসমূহ অযাচিত হস্তক্ষেপ থেকে সংরক্ষিত রাখা :

৮/১/১ ওয়েবে ব্যবসায়িক পেজগুলো তাদের মালিকদের ব্যক্তিগত অধিকার হিসেবে গণ্য হবে এবং এতে হস্তক্ষেপের দরুন ক্ষতিপূরণ আবশ্যক হবে।

৮/১/২ ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য তাদের ওয়েব পেজগুলোতে প্রতিষ্ঠানের অধিকার ও তাদের সাথে লেনদেনকারীদের অধিকার সংরক্ষণার্থে এবং অযাচিত হস্তক্ষেপমুক্ত রাখতে সব ধরনের সম্ভাব্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৮/১/৩ ওয়েবের মাধ্যমে লেনদেনকারীদের তথ্যভাণ্ডারে অযাচিত হস্তক্ষেপ করা হারাম, তেমনি এগুলোর মালিকদের স্পষ্ট অনুমতি ব্যতিরেকে তা অন্যত্র বিক্রি বা হস্তান্তর করা হারাম।

৮/১/৪ সমাজের প্রচলন, আন্তর্জাতিক নীতিমালা, যা শরীয়তবিরোধী নয় এবং ইসলামী শরীয়তের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক পেজে অযাচিত হস্তক্ষেপ তথ্যভাণ্ডার চুরির অপরাধ প্রমাণিত হবে।

৮/১/৫ অযাচিত হস্তক্ষেপের দরুন প্রাপ্য ক্ষতিপূরণে প্রত্যক্ষ আর্থিক ক্ষতি ও বাস্তবিকভাবে যা ছুটে গেছে তা অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং প্রয়োজনে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের সহায়তা গ্রহণ করতে পারবে।

৮/১/৬ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য তা দাবি করা আবশ্যক এবং ইসলামী শরীয়তের মূল নীতিমালা ও বিধি-বিধান আলোকে প্রণীত নীতিমালার প্রতি লক্ষ রেখে অযাচিত হস্তক্ষেপের বিষয়ে অবগত হওয়ার পর এর ক্ষতিপূরণ দাবি করার কোনো নির্ধারিত সময়সীমা নেই।

৮/১/৭ ওয়েবে সংরক্ষিত পেজ থেকে অর্থ বা গোপনীয় ডকুমেন্ট চুরি হয়ে গেলে, যে ব্যক্তি সরাসরি এ কাজে জড়িত তার ওপর দায় বর্তাবে, অতঃপর শরয়ী কারণবশত সরাসরি দায়ী ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ দিতে অপারগ হলে যার কারণে এ কাজ হয়েছে তার ওপর দায় বর্তাবে। এবং পেজের মালিক দায়ী হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত পেজ সংরক্ষণার্থে সম্ভাব্য সব ধরনের নিরাপত্তামূলক পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকে আর পেজের মালিক সর্বাবস্থায় স্পষ্ট দায়ভার গ্রহণ না করে থাকে।

৮/২ লেনদেনকারীদের পরিচয় শনাক্তকরণ :

৮/২/১ প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রতিষ্ঠানের সম্পদ সংরক্ষণার্থে এর সাথে ওয়েবের মাধ্যমে লেনদেনকারীদের পরিচয় শনাক্ত করতে সব ধরনের সতর্কতা ও উপায় গ্রহণ করা এবং তারা সঠিকভাবে চুক্তি সম্পাদনের যোগ্য কি না, তা নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক।

৮/২/২ লেনদেনকারীদের পরিচয় শনাক্ত করতে ইলেকট্রনিক স্বাক্ষরকে (ফিঙ্গারপ্রিন্ট) মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা বৈধ। তবে শর্ত হলো, আন্তর্জাতিক নীতিমালা কর্তৃক তা শনাক্ত করার মাধ্যম হিসেবে অনুমোদিত হতে হবে।

৮/২/৩ যদি কোনো লেনদেনকারীর ব্যক্তিত্বে বা তার গুণাবলিতে প্রতারণা,

জাল বা ভুয়া প্রমাণিত হয় তাহলে অপর পক্ষের জন্য চুক্তি বাতিল করার অধিকার সাব্যস্ত হবে।

৮/২/৪ প্রতারণা, জাল বা ভুয়া প্রমাণিত করতে প্রমাণ করার সাধারণ নীতিমালার প্রতি লক্ষ রাখা হবে।

৮/৩ লেনদেনকারীদেরকে সম্মতি চুক্তি (আকদে ইয'আন) থেকে রক্ষা করা :

৮/৩/১ ইন্টারনেটের পেজের মাধ্যমে সম্পাদিত অধিকাংশ চুক্তির মধ্যে যেহেতু ইজাব তথা প্রস্তাব প্রদান জনসাধারণের জন্য হয় ও চুক্তির বর্ণনা এককভাবে প্রদান করা হয় এবং প্রস্তাব প্রদানকারী অপর পক্ষের পরিবর্তনের কোনো

অধিকার না রেখে এককভাবে চুক্তির শর্তাবলি নির্ধারণ করে থাকে। সুতরাং এই চুক্তিগুলো সম্মতি চুক্তি হিসেবে ধর্তব্য হবে, যদি তা এমন পণ্য বা উপস্বত্বসংশ্লিষ্ট হয়, যা জনসাধারণের প্রয়োজন এবং তা উপেক্ষা করা যায় না, এমতাবস্থায় প্রস্তাব প্রদানকারী আইনানুগভাবে বা বাস্তবিকভাবে মজুদদারি হবে নতুবা এমন আধিপত্য বিস্তারকারী হবে, যার কারণে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা সীমিত পর্যায়ে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

৮/৩/২ ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্পাদিত সম্মতি চুক্তিগুলো লেনদেনের জন্য উন্মুক্ত করার পূর্বে রাষ্ট্রীয় পর্যবেক্ষণের অধীনে রাখা শরয়ীভাবে আবশ্যক, আর তা ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং প্রস্তাব প্রদানকারীর পক্ষ থেকে অন্যায় দূর করার মাধ্যমে লেনদেনকারীদের অধিকার সংরক্ষণার্থে হবে।

৮/৩/৩ ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্পাদিত সম্মতি চুক্তির ক্ষেত্রে মূল্য যদি ন্যায্য হয় এবং চুক্তির শর্তাবলিতে প্রস্তাবকারীর পক্ষ থেকে অন্যায়মূলক কিছু না থাকে, তাহলে উক্ত চুক্তি শরয়ীভাবে সঠিক এবং তা কার্যকর করা আবশ্যক।

৮/৩/৪ যদি ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্পাদিত সম্মতি চুক্তির ক্ষেত্রে অন্যায্য মূল্য নির্ধারণ করা হয় (যাতে মারাত্মক ধোঁকা রয়েছে) অথবা চুক্তির শর্তাবলি অপর পক্ষের জন্য অন্যায়মূলক হয় তাহলে ওই পক্ষের জন্য আদালতের শরণাপন্ন হয়ে চুক্তি বাতিলের আবেদন করা বা ক্ষতি দূর হয়, এমন শর্তাবলি সংশোধনের অধিকার রয়েছে।

৮/৪ ওয়েবের মাধ্যমে সম্পাদিত চুক্তির বিষয়বস্তু যদি গুণ বর্ণনার মাধ্যমে, দর্শনের ওপর ভিত্তি করে বা নমুনার দিকে সম্পৃক্ত করে হয়, অতঃপর হস্তান্তরের সময় তা বর্ণিত গুণের বিপরীত, দর্শন থেকে ভিন্নরূপ বা নমুনার বিপরীত পাওয়া যায়, তাহলে গ্রাহকের জন্য কাঙ্ক্ষিত গুণের খিয়ার সাব্যস্ত হবে, ফলে তার জন্য চুক্তি বাতিল করা, বহাল রাখা বা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অন্য পক্ষের সাথে চুক্তি করার অধিকার থাকবে।

৯. মানদণ্ড প্রকাশের তারিখ :

১৭ রবিউল আউয়াল ১৪৩০ হিজরী অনুযায়ী ১৫ মার্চ ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ।

ই-বাণিজ্যবিষয়ক ইন্ডিয়া ফিকহ একাডেমির নীতিমালা

নব উদ্ভাবিত যোগাযোগব্যবস্থার মাধ্যমে লেনদেন চুক্তিসমূহ :

১. মজলিস বা বৈঠক দ্বারা উদ্দেশ্য, এমন অবস্থা যাতে উভয় পক্ষ কোনো লেনদেন করার জন্য ব্যস্ত থাকে। "বৈঠক এক হওয়া" দ্বারা উদ্দেশ্য একই সময়ের মধ্যে ইজাব বা প্রস্তাবটি কবুল বা প্রস্তাব গ্রহণের সাথে মিলিত হওয়া, এবং "ভিন্ন বৈঠক" দ্বারা উদ্দেশ্য একই সময়ের মধ্যে ইজাব-কবুল পাওয়া না যাওয়া।

২.

(ক) ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ফোনে এবং ভিডিও কলের মাধ্যমে ইজাব-কবুল গ্রহণযোগ্য হবে। ইন্টারনেটেও যদি একই সময়ে উভয় পক্ষ বিদ্যমান থাকে ও ইজাব দেওয়ার পর অপর পক্ষ থেকে কবুল পাওয়া যায় তাহলে ক্রয় সংঘটিত হয়ে যাবে এবং এমতাবস্থায় উভয় পক্ষকে একই বৈঠকে গণ্য করা হবে।

(খ) যদি ইন্টারনেটে কোনো ব্যক্তি বিক্রয়ের আগ্রহ প্রকাশ করে এবং ওই মুহূর্তে অপর পক্ষ ইন্টারনেটে বিদ্যমান না থাকে, পরবর্তীতে সে আগ্রহ প্রকাশকারীর বার্তা পেয়ে থাকে, তাহলে উক্ত পদ্ধতি পত্রের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়ের আওতাভুক্ত হবে এবং যে সময় অপর পক্ষ আগ্রহ বার্তা পড়বে ওই সময় তার পক্ষ থেকে কবুল পাওয়া আবশ্যক হবে।

৩. যদি ক্রেতা-বিক্রেতা নিজেদের লেনদেন গোপন রাখতে চায়, আর এর জন্য গোপন কোড (Secret Code) ব্যবহার করে থাকে তাহলে কারো জন্য উক্ত লেনদেন সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা বৈধ হবে না, তবে যদি অন্য কারো কোনো প্রকারের অধিকার উক্ত চুক্তিসংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে তাহলে তার জন্য ওই গোপন লেনদেন সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া বৈধ।

৪. বিয়ে-শাদি ক্রয়-বিক্রয়ের লেনদেন থেকে বেশি স্পর্শকাতর, এতে ইবাদতের অংশও রয়েছে এবং দুজন সাক্ষীর শর্তও রয়েছে। এ জন্য ইন্টারনেট, ভিডিও কল ও ফোনের মাধ্যমে বিয়ের ইজাব-কবুল গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে যদি এসব যোগাযোগমাধ্যম দ্বারা বিয়ের উকিল নিযুক্ত করা হয় এবং সে সাক্ষীদ্বয়ের সামনে নিজের মক্কেলের পক্ষ থেকে ইজাব-কবুল করে নেয় তাহলে বিয়ে হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় এটা আবশ্যক যে সাক্ষীদ্বয় অনুপস্থিত মক্কেল সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া অথবা ইজাব-কবুলের সময় মক্কেলের নাম পিতার নামের সাথে উল্লেখ করা। (ইন্টারনেট আওর জাদিদ যারায়ে আবলাগ দ্বীনি মাকাসিদ আওর উকূদে মুআমালাত কেলিয়ে ইসতিমাল, পৃ. ২১৭)

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায় : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

প্রসঙ্গ : বিয়ে

মুহাম্মদ আমিরুল ইসলাম
মধ্যবাড্ডা, ঢাকা।

জিজ্ঞসা :

আমার ছেলে একটি মেয়েকে বিবাহ করেছে। মেয়েটির পূর্বে একটি বিয়ে হয়েছিল। মেয়েটি আবার দ্বিতীয় বিয়ে করে অপর একটি ছেলের সঙ্গে। কাবিননামায় উল্লেখ করা হয় মেয়েটি কুমারী। এই অবস্থায় আমার ছেলের সঙ্গে মেয়েটির প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একপর্যায়ে মেয়েটি তার দ্বিতীয় স্বামীকে তালাক দেয়। এরপর আমার ছেলে মেয়েটিকে গোপনে বিয়ে করে। এবং কাবিননামায় মেয়েটিকে কুমারী উল্লেখ করা হয়। আমি বিয়ের খবর জানার পর আমার ছেলেকে বলি, এই বিয়ে অবৈধ, আমি এই বিয়ে মানি না। এবং আমি ছেলেকে বাসা হতে বের করে দিই। এরপর সে এই মেয়েকে তালাক না দিয়ে দ্বিতীয়বার বিয়ে করে সংসার করছে। আমি আজ পর্যন্ত তাদেরকে মেনে নিইনি এবং বাসায় উঠতে দিইনি। অতএব হাদীস মোতাবেক এই বিয়ে বৈধ নাকি অবৈধ। অবৈধ হলে আমার ছেলের ব্যাপারে আমার করণীয় কী? অথবা আমি কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে ইসলামের দৃষ্টিতে সমাধান বা মুক্তি পাব?

সমাধান :

স্বামী-স্ত্রী তালাক কিংবা খোলার মাধ্যমে পৃথক হওয়ার পর ইদ্দত তথা তিন হায়েয অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে স্ত্রীর জন্য অন্যত্র বিয়ে করা জায়েয নেই। তাই উল্লিখিত বিবরণ মতে মেয়েটি তার আগের স্বামীর সাথে খোলা করার পর ইদ্দত পালন শেষে যদি আপনার ছেলের সাথে দ্বিতীয়বার বিয়ে হয়ে থাকে, তাহলে তাদের দ্বিতীয় বিয়ে সহীহ হয়েছে অন্যথায় হয়নি।

(মুসনাদে আহমাদ-১৩/২২৫, বাদায়েউস সানায়ে-৪/৪৪৫, আদ্দুররুল মুখতার-৩/৫২৯)

প্রসঙ্গ : মুসাফির

মুহাম্মদ হাসিব আশরাফ
পিরোজপুর।

জিজ্ঞাসা :

একটি তাবলীগ জামাত এক চিল্লার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় আসে এবং তাদের এ মর্মে সিদ্ধান্ত হয় যে তারা পুরো সময়টাই ঢাকা শহরের বিভিন্ন মসজিদে ব্যয় করবে। এখন আমার জানার বিষয় হলো :

(১) তারা ঢাকায় অবস্থানরত সময়ে মুকীম বলে গণ্য হবে, নাকি মুসাফির হবে?

(২) মুসাফির ব্যক্তি যদি কোনো কারণে জুমু'আর নামাযে শরীক হতে না পারে, তাহলে সে জোহরের নামায কত রাক'আত পড়বে? দুই রাক'আত নাকি চার রাক'আত?

সমাধান-১ :

শরয়ী দৃষ্টিকোণে শহর ও পৌরসভার পুরো এরিয়া এবং গ্রামের প্রতিটি মহল্লা এক স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়। বিধায় প্রশ্নোক্ত তাবলীগ জামাতের সাথীরা চল্লিশ দিনের নিয়্যাতে ঢাকা সিটিতে অবস্থানরত সময়ে মুকীম বলে গণ্য হবে।

(ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-১/১৪০, হেদায়া-১/৩৬৩, বাদায়েউস সানায়ে-১/৯৮)

সমাধান-২ :

মুসাফির ব্যক্তি যদি কোনো কারণে জুমু'আর নামাযে শরীক হতে না পারে, তাহলে সে জোহরের দুই রাক'আত পড়বে।

(ফাতাওয়ায়ে তাতার খানিয়া-২/৫৯০, হেদায়া-১/৩৬১)

প্রসঙ্গ : কার্টুন-ছবি

মুহাম্মদ হাসান
দোহার, ঢাকা।

জিজ্ঞসা :

ছোটদের পোশাক, বই-খাতা ও বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে অনেক সময় কার্টুন-ছবি থাকে। এখন আমার জানার বিষয় হলো : এসব কার্টুন-ছবি হাদীসে বর্ণিত ছবির অন্তর্ভুক্ত কি না? কোরআন ও হাদীসের আলোকে জানাবেন।

সমাধান :

শরীয়তের দৃষ্টিতে যে সকল কার্টুন-ছবির মধ্যে প্রাণীর আকৃতি ফুটে ওঠে তা হাদীসে বর্ণিত ছবির অন্তর্ভুক্ত।

(সহীহ মুসলিম-৭৪৫, তাকমিলাতু ফাতহুল মুলহিম-৪/১৫৮, রদ্দুল মুহতার-১/৬৪৭)

প্রসঙ্গ : মহিলাদের মসজিদে যাওয়া

মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন
কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

জিজ্ঞসা :

আমাদের গ্রামে একটি প্রাচীনতম মসজিদ ও মাদরাসা আছে। কিছুদিন আগে দ্বিতলবিশিষ্ট মসজিদ ভেঙে নতুন করে তৃতীয় তলাবিশিষ্ট মসজিদ করা হয়।

উল্লেখ্য, আমাদের দুই ভাই একজন দ্বিতীয় তলা আরেকজন তৃতীয় তলা

বানানোর খরচ বহন করেন। তাঁরা বলেন, তৃতীয় তলায় মহিলাদের জামা'আত করার জন্য আলাদা সিঁড়ির ব্যবস্থা করেন। এখন আমার জানার বিষয় হলো : মহিলাদের মসজিদে এসে জামা'আতের সাথে নামায আদায় করার ব্যাপারে শরীয়তের ফয়সালা কী?

সমাধান :

রাসূল (সা.)-এর যুগে মহিলাদের মসজিদে গমন-আগমন ফেতনামুক্ত থাকায় মসজিদে নামায আদায়ের অনুমতি থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে ঘরে নামায আদায়ের ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া হতো। কিন্তু পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে তাঁদের মাঝে কিছু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হওয়ায় হযরত উমর (রা.) এবং তাঁর ছেলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মতো বিজ্ঞ সাহাবায়ে কেরামের জামা'আত তাঁদেরকে মসজিদে আসতে বারণ করেন। অপরদিকে বৃদ্ধা মহিলাদের ক্ষেত্রে মতানৈক্য থাকলেও পরবর্তী উলামায়ে কেরাম বৃদ্ধা যুবতী সকল শ্রেণীর মহিলাদের মসজিদে এসে পাঁচ ওয়াক্ত নামায, তারাবি, জুমু'আ ও ঈদের নামায জামা'আতের সাথে আদায় করাকে মাকরূহে তাহরীমি বলেছেন। বিধায় মহিলাদের জন্য মসজিদে এসে জামা'আতের সাথে নামায আদায় করা শরীয়তসম্মত হবে না এবং তাঁদের জন্য মসজিদে জামা'আতের ব্যবস্থাকারী সাওয়াবের পরিবর্তে গোনাহের ভাগী হবেন।

(সহীহুল বোখারী-১/১২০) আদ্দুররুল মুখতার-১/৫৬৬, ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-১/৮৯)

প্রসঙ্গ : জামা'আত

মুহাম্মদ ফখরুল ইসলাম
খিলক্ষেত, ঢাকা।

জিজ্ঞাসা :

আমি এক মসজিদের ইমাম। উক্ত মসজিদের দক্ষিণ পার্শ্বে দেয়ালের পর প্রায় দেড় ফুট জায়গা ফাঁকা রয়েছে। এই ফাঁকা জায়গার পর আরেকটি দেয়াল রয়েছে। বিশেষ করে জুমু'আর দিনে কিছু মুসল্লি ওই দ্বিতীয় দেয়ালের পর এক্তেদা করে। এখন আমার জানার বিষয় হলো : তাদের এক্তেদা সহীহ হবে কি না?

সমাধান :

প্রশ্নোল্লিখিত বর্ণনা অনুযায়ী দ্বিতীয় দেয়ালের পরে যে সমস্ত মুসল্লি অবস্থান করে তারা যদি ইমামের অবস্থা সম্পর্কে জানতে সক্ষম হয়, তাহলে তাদের এক্তেদা সহীহ হবে অন্যথায় নয়।

(উমদাতুল কারী-৫/২৬৪, রদ্দুল মুহতার-১/৫৮৮, আহসানুল ফাতাওয়া-৩/৩০৬)

প্রসঙ্গ : ওয়ারাসাত

মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান
ধোবাউড়া, মোমেনশাহী।

জিজ্ঞাসা :

১. আমাদের এলাকায় আব্দুল মজিদ নামের এক ব্যক্তি ইন্তেকাল করেন। তাঁর দুই ছেলে ও পাঁচ মেয়ে। তবে এক মেয়ে তাঁর ইন্তেকালের পূর্বেই এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে মারা যান। এখন আমার জানার বিষয় হলো :

যেই মেয়ে আব্দুল মজিদের ইন্তেকালের পূর্বেই মারা গেছেন তাঁর সন্তানাদিরা আব্দুল মজিদের তরকা হতে সম্পত্তি পাবে কি না?

২. ইসলামী আইন অনুযায়ী না পেলেও যদি সরকারি আইন মোতাবেক তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি দেওয়া হয় এবং এর মধ্যে অন্য ওয়ারিশিনদের কেউ ইসলাম সম্পর্কে জেনে বা না জেনে যদি আপত্তি না করে, তবে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো সমস্যা আছে কি না?

সমাধান ১-২ :

ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী মরহুম আব্দুল মজিদের মৃত মেয়ের সন্তানাদিরা আব্দুল মজিদের রেখে যাওয়া সম্পত্তি হতে কোনো কিছু পাবে না।

তবে অন্য ওয়ারিশগণ যদি সাবালেগ হয়ে থাকে, তাহলে তাদের সম্মতিক্রমে সেই মৃত মেয়ের সন্তানাদিদের অনুগ্রহপূর্বক কিছু সম্পত্তি দেওয়া মানবতার পরিচায়ক। শরীয়ত এ ব্যাপারে ওয়ারিশদের উদ্বুদ্ধও করে থাকে।

(আল বাহরুর রায়েক-৯/৩৯৭) ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-২/৪৫৮-৪৫৯, আহকামুল কোরআন-২/১৩৪)

প্রসঙ্গ : ওজু

মুহাম্মদ নূর হাবীব
বসুন্ধরা, ঢাকা।

জিজ্ঞসা :

আমাদের বাড়িতে একজন মহিলার নাকে নাকফুল দেওয়ার উদ্দেশ্যে ছিদ্র করা হয়েছিল। ছিদ্র করার পরে আর নাকফুল ব্যবহার করেননি। তাই এক আলেম বলেছিলেন, উক্ত ছিদ্রে ওজু ও গোসলের সময় পানি দাখেল করতে হবে। এখন আমার জানার বিষয় হলো :

উক্ত ছিদ্রে পানি দাখেল করতে হবে কি হবে না?

সমাধান :

প্রশ্নে বর্ণিত মহিলার জন্য ওজু ও ফরয গোসলের সময় আঙুল দিয়ে ঘষে ঘষে উক্ত ছিদ্রে পানি পৌঁছানো জরুরি। তবে কাঠি ইত্যাদি প্রবেশ করিয়ে পানি পৌঁছানো জরুরি নয়।

(রদ্দুল মুহতার-১৫২, ফাতাওয়ায়ে তাতার খানিয়া-১/২৭৫, খয়রুল ফাতাওয়া-২/৫০)

প্রসঙ্গ : বিয়ে

মাও. জামাল উদ্দিন
জয়দেবপুর, গাজীপুর।

জিজ্ঞাসা :

কোনো অনুষ্ঠানে দুই বোনের একসাথে বিবাহ হয়। অতঃপর বিয়ের কাবিননামা

আলাদা আলাদা লিপিবদ্ধ করা হয় এবং বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে বউকে তুলে দেওয়ার সময় ভুলক্রমে বিপরীত গাড়িতে, অর্থাৎ যার সাথে বিয়ে হয়েছে তার বিপরীত স্বামীর গাড়িতে তুলে দেওয়া হয়। বিয়ের এক দিন পর তারা জানতে পারে যে তাদের বিয়ে অপর ছেলের সাথে হয়েছিল। এখন এ ব্যাপারে শরয়ী সমাধান কী হতে পারে?

সমাধান :

দুই বোনের বিবাহ যার যার স্বামীর সাথে এখনো ঠিক আছে। তাই উভয় বোন জানার সাথে সাথে বেগানা পুরুষটির সঙ্গ ছেড়ে যার যার স্বামীর কাছে চলে যাবে। তবে এক হায়েয হওয়া পর্যন্ত উভয় বোন নিজের স্বামীর সাথে সহবাস করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং এ ধরনের ভুলের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চেয়ে নেবে।

(আদ্দুররুল মুখতার-৩/৩৪, রদ্দুল মুহতার-৩/৩৪, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া-১৩/২১২)

প্রসঙ্গ : ছাত্রদের খোরাকি

মুফতী সাইফুল ইসলাম
ফেনী।

জিজ্ঞাসা :

আবাসিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে সকল ছাত্র প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত মাসিক খোরাকির টাকা দিয়ে থাকে, দেখা যায় কিছু কিছু মাদরাসায় ছুটির দিনগুলোর টাকা হিসাব করে ফেরত দেয়। আবার কোথাও এমন করা হয় না বরং বলা হয়ে থাকে যে এক দিন খেলেও সারা মাসের নির্ধারিত টাকা আদায় করতে হবে। এখন আমার জনার বিষয় হলো :

এমন নিয়ম করা যে, একদিন খেলেও পূর্ণ টাকা দিতে হবে, শরীয়ত কতটুকু সমর্থন করে? আর যদি শরীয়তসম্মত না হয়, তাহলে এযাবত এমন মুয়ামালা যে সকল ছাত্রের সাথে করা হয়েছে হিসাব করে তাদের পাওনা ফেরত দেওয়া আবশ্যক কি না?

সমাধান :

প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ এবং ছাত্রপক্ষের মধ্যে শুরু থেকে এ ধরনের চুক্তি (এক দিন খানা খেলেও পূর্ণ মাসের টাকা পরিশোধ করতে হবে) থাকলে পুরা মাসের টাকা নেওয়া জায়েয, অন্যথায় জায়েয হবে না।

(ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-৪/৪২১, ইমদাদুল ফাতাওয়া-৩/৩৪৮, ইমদাদুল আহকাম-২/৫৮৩)

প্রসঙ্গ : মান্নত

মুহাম্মদ হাসানুল আলম
বাঘা, রাজশাহী।

জিজ্ঞাসা :

একবার আমার মেয়ে খুব অসুস্থ হয়ে যায়। আমি নামায, রোযা, সদকাসহ এটাও মান্নত করেছিলাম যে আমার মেয়ে যদি সুস্থ হয়ে যায়, তাহলে আমি হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর কবর জিয়ারত করব। আল্লাহর অনুগ্রহে আমার মেয়ে সুস্থ হয়ে ওঠে। আমি জিয়ারত করতে যেতে চাইলে একজন আমাকে বলে, আপনার জন্য এই মান্নত পূরণ করা জরুরি নয়, বরং নাজায়েয। এখন আমার জানার বিষয় হলো :

আমি যদি শুধু জিয়ারতের জন্যই যাই অর্থাৎ সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাস পড়ে দু'আ করে আসি, তাহলেও কি আমি গোনাহগার হবো, কেউ অসুস্থ হলে এভাবে মান্নত করা এবং তা পূরণ করার ব্যাপারে শরীয়তের দিকনির্দেশনা কী?

সমাধান :

মাজার জিয়ারতের জন্য মান্নত করা সহীহ নয়। বিধায় প্রশ্নে বর্ণনানুযায়ী আপনি যেহেতু আপনার মেয়ে সুস্থ হলে শাহজালাল (রহ.)-এর মাজার জিয়ারতের মান্নত করেছেন, তাই তা সহীহ হয়নি। অতএব আপনার জন্য এই মান্নত পূরণ করা আবশ্যক নয়। তবে আপনি যদি শরীয়তসম্মত পন্থায় কবর জিয়ারত করেন এবং মাজারসংশ্লিষ্ট বিদ'আত থেকে পুরোপুরি বিরত থাকেন, তাহলে শরয়ী দৃষ্টিকোণে কোনো সমস্যা নেই।

(সহীহুল বোখারী-হা., ১১৮৯, ফয়জুল বারী-২/৫৮৮, রদ্দুল মুহতার-৩/৭৩৬)

প্রসঙ্গ : মাদরাসার চাঁদা

মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ
ঈদগাহ, কক্সবাজার।

জিজ্ঞাসা :

আমাদের মাদরাসার বার্ষিক সভায় বিভিন্ন ধরনের উলামা-মাশায়েখকে দাওয়াত দেওয়া হয়। এবং বার্ষিক সভার জন্য চাঁদাকৃত টাকা থেকে মোহতামিম সাহেবের অনুমতিক্রমে তাদেরকে হাদিয়া দেওয়া হয়। কোনো কোনো সময় তাদের সাথে গাড়ির ড্রাইভার ও খাদেম ইত্যাদি থাকে, তাদেরকেও সেই ফান্ড থেকে টাকা দেওয়া হয়। এখন আমার জনার বিষয় হলো :

যে বার্ষিক সভা উপলক্ষে চাঁদাকৃত টাকা থেকে খাদেম এবং ড্রাইভারকে দেওয়া শরীয়তসম্মত কি না?

সমাধান :

বার্ষিক সভাকে কেন্দ্র করে যাঁরা দান করেছেন, তাঁরা যদি ব্যয়ের কোনো খাত নির্ধারণ না করে থাকেন, তাহলে মাদরাসার মোহতামিম সাহেবের অনুমতিক্রমে খাদেম ও ড্রাইভারকেও সেখান থেকে হাদিয়া দেওয়া যাবে।

(রদ্দুল মুহতার-২/২৬৯, আল বাহরুর রায়েক-৫/৩৬২, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া-১০/১৪০)